শ্রীপ্রবোধ নাথ

প্রীতিভাজনেষু

লেখকের কয়েকটি সদ্য প্রকাশিত বই

দেশ কাল পাত্র

মন যারে চায়

আজকের নায়ক

আপনজন

বসন্ত ও ঝরাপাতা

আলোয় অন্ধকারে

ছুটি পড়লেই ভেতো বাঙ্গালীর কলকাতার ইট কাঠ কনক্রিটের শহরের খাঁচা থেকে দিন কয়েক ডানা মেলে পালাবার দুস্তর সখ জাগে।

এই পলায়নশীল বাঙ্গালীর মনের খবর জানে কন্যাকুমারীর দোকানদার, রসম স্বাদম সম্ভরম বেচা তামিল দোকানদার, দ্বারকাতীর্থের ভুজিওয়ালা, বেট দ্বারকার নৌকার মাঝি রহমান সাহেব, জানে গোয়ার হোটেলের ডিসুজা, পেরাবার দল—জানে কেদারবদরীর পথে চটিওয়ালারাও।

আর কলকাতার সমাজে ছুটিতে যে বঙ্গসন্তান বেরুতে পারে না, পাড়ায় সমাজে তাকে অনেকেই করুণার চোখেই দেখে। আহা! বেচারা!

কেউ নিদেন পুরী, দেওঘর, শিমুলতলা অবধি গিয়েও ফিরে এসে নানা গল্প ফেঁদে এবার আসর জমায়। মোদ্দা কথা বাঙ্গালী মৌকা পেলে ঘর থেকে বের হয়ে প্রমাণ করতে চায় আদৌ সে ঘরকুনো নয়, ভ্রমণবিলাসী।

সেই ভ্রমণবিলাসীদের দলে অবশ্য রঞ্জন আর অঞ্জনকে ফেলা ঠিক হবে না। এখন দুজনের কেউই সংসারের বেড়াজালে বন্দী হয়নি। বেশ কৌশল করে পাঁকাল মাছের মতো জালের বেষ্টনী থেকে হড়কে হড়কে গেছে দুই বন্ধুতেই। অবশ্য পাত্র হিসাবে উভয়েই সু-পাত্র। আর ছেলে হিসেবেও হীরের টুকরোই বলা যেতে পারে, দুই মূর্তিকে। রঞ্জন চ্যাটার্জি আর অঞ্জন ব্যানার্জি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষার ধাপ ভালোভাবে সসম্মানে পাশ করে দুজনেই ডক্টরেট করার জন্য থিসিস তৈরী করছে।

রঞ্জন বোটানির কৃতি ছাত্র, সে এর মধ্যে ভারতের অরণ্যভূমির নানা গাছ-গাছাড়ির উপর গবেষণা করছে। অরণ্যের বহু নাম না জানা, অচেনা গাছ, লতা, নানা ধরণের গুল্ম, ফার্ণ প্রভৃতির উপর তার গবেষণার কাজ চলছে। রঞ্জন জানে এই মূল্যবান গবেষণা তাকে নামডাক এনে দেবেই।

ট্রপিক্যাল ফরেস্ট যে যে দেশে আছে সেখানেই অরণ্যপ্রেমীরা তাকে চিনবে তার গবেষণার জন্য।

কলকাতার একটা নামী কলেজে বোটানির অধ্যাপনার কাজও সবে পেয়েছে, তবে অধ্যাপনার চেয়ে গবেষণার কাজই তার বেশী ভালো

লাগে। অরণ্যভূমিকে আজ রক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করেছে সব দেশের মানুষ। রঞ্জনও অরণ্যপ্রেমী, সে মনে প্রাণে চায়, ওই শ্যামসজীবতা বেঁচে থাকুক পৃথিবীর বুকে। মানুষ প্রকৃতিকে ভালোবাসলেই এটা করা সহজ হবে। তাই গাছের কথা সে ভাবে মনে প্রাণে, তাই ওদের বাঁচাবার জন্য, তাদের নিবিড় করে চেনার জন্যই রঞ্জনের ওই গবেষণা। ডক্টরেট পেয়েছে তবু তার গবেষণা থামেনি।

আর অঞ্জন ব্যানার্জি ভূ-স্তরে নানা খনিজ পদার্থ কোল, বক্সাইট, আকরিক লোহা, ম্যাঙ্গানীজ অভ্র এইসব নিয়েই পড়াশোনা করেছে। ভূ-তত্ত্বের সে কৃতি ছাত্র। সেও কোন কলেজের অধ্যাপক, আর ভারতের বহু অরণ্য পর্বতে, মধ্যপ্রদেশের সদ্য আবিষ্কৃত খনি অঞ্চলেও ঘুরেছে সে, ঘুরেছে বিহারের মাইকা মাইনস-এ—উড়িষ্যার বনে, পর্বতে এই বিভিন্ন খনিজ দ্রব্যের গবেষণার কাজে।

ওদের ঘোরাটা তাই গড় বাঙ্গালীর সেই মরসুমী পাখীর মত ঘোরা নয়, আমেরিকান ট্যুরিস্টদের মতো এ বেলায় তাজ, ও বেলায় কুতবমিনার দেখার মতো নয়।

ওরা দুই বন্ধুতে মাঝে মাঝে বের হয়, ম্যাপের বাইরের কোন অচেনা অরণ্য পর্বত অঞ্চলে। সেখানের ফরেস্ট বাংলো না হয় অন্য কোন আশ্রয়ে থাকে দু-দশদিন। পায়ে হেঁটে বনপাহাড়ে ঘোরে, আর একজন তার গাছগাছালি, পাতা, শিকড়, ফল ফুল সংগ্রহ করে, আর অঞ্জন সংগ্রহ করে ভূ-স্তরের নানারকম পাথর, সিলিকা এইসব।

তাই নিয়ে চলে ওদের গবেষণা।

তাই বেড়ানোটা ওদের কাছে বিলাস নয়, প্রয়োজন। সামনে গ্রীষ্মের ছুটি পড়ছে। দীর্ঘদিনের জন্য কলেজ বন্ধ। ওরা এই ফাঁকে বের হয়ে যায়। আর বের হয়ে যায় ওরা দূর দুর্গমে, না হয় কোন বনপাহাড়ে। সেখানে তাই আগে থেকে পারমিশান, বাংলো না হয় ফরেস্ট বাংলো বুকিংও করতে হয়।

তাই আগে থেকেই শুরু হয় ওদের দুজনের প্ল্যান প্রোগ্রাম।

রঞ্জনের বাবা সমরেশবাবু জানেন ছেলের মতি গতির খবর। তিনি বাধা দেন না, তবে গোল বাধায় রঞ্জনের মা, প্রতিবারই বাগড়া দেয়।

এবারও বলে ললিতা ছেলেকে।

—তোদের ওই বন বাদাড় ছাড়া যাবার জায়গা আর নেই? লোকে

দিল্লী বোম্বাই গোয়া কোথায় কোথায় যায়, ক'দিন আরামে থাকে। আর তোদের বেড়ানো ওই বনে বনে!

অঞ্জন বলে—বনেই এখন শান্তি মাসীমা। দেখেন নি, মুনি ঋষিরা সবাই সংসার ছেড়ে বনেই তপস্যা করে।

ললিতাদেবী বলে।

—কথা শোনো ছেলের, এবার বলছি তোর মাকে—

ছেলের বিয়ে থা দিক, নাহলে বনে বনে সন্ন্যাসী হয়েই ঘুরবে।

অঞ্জন বলে—একা শাস্তিটা আমিই পাবো মাসিমা? রঞ্জনই তো আমাকে বন পাহাড় চিনিয়েছে, দোষ তো ওরই।

ললিতাদেবীও ভেবেছে কথাটা।

স্বামী সমরেশবাবুকে ও বলেছে বার বার ছেলের বিয়ে দাও। কিন্তু ছেলে বেঁকে বসেছে, বিয়ে সে করবে না।

ললিতাদেবী বলে—এবার তার ব্যবস্থা তো করছি, দুটোকেই এবার আটকাবো। খুব বেড়েছিস তোরা।

অঞ্জন বলে—এখন এবারের বেড়ানোটা সেরে আসি, তারপর ভাবা যাবে।

ম্যাপও যোগাড় করেছে রঞ্জন।

সারান্দা পাহাড়ের দিকেই যাবে তারা। বিহার-উড়িষ্যা সীমান্তে এই বিস্তীর্ণ বন পাহাড়ের রাজ্য, সাতশো পাহাড়ের দেশ এই সারান্দা।

রঞ্জন এর মধ্যে সারান্দা সম্বন্ধে অনেক খবরই সংগ্রহ করেছে।

বলে রঞ্জন—এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সেরা শালের জঙ্গল।

অঞ্জন বলে—তরাই অঞ্চলের শালই তো সেরা শুনেছি।

রঞ্জন শোনায়,—এখানে শাল গাছ আছে কয়েকশ' বছরের, আর সেরা শাল, তরাই-এ শাল হয় প্রচুর, লগও অনেক হয়। সত্যি, কিন্তু সারান্দাই সেরা। চল না গিয়ে দেখবি কেমন জঙ্গল, হাতি তো প্রচুর বাইসন, হরিণ, সম্বর, বনশুয়োর মায়রয়েল বেঙ্গল টাইগার—কিংকোবরা ময়াল কি নেই?

ললিতাদেবী বলে—ওই জঙ্গলে যাবি?

হাসে রঞ্জন, বলে—মা, ওই বনের জানোয়াররা কিন্তু শহরের মানুষের চেয়ে অনেক কম হিংস্র, ওদের ক্ষতি না করলে ওরা কারোও ক্ষতি করে না।

অঞ্জন এর মধ্যে ফরেস্ট বাংলোতে থাকার জন্য বুকিং করতে বনের

অধিকর্তাকে লিখেছে, আর ওই গভীর বনের মধ্যে ফরেস্ট বাংলোতে আট দুশদিন থাকতে হবে। সেখানে কিছুই মেলে না।

বাইরের কোন আধা শহর থেকে জিপ ভাড়া করে ওখানকার বাজার থেকে চাল ডাল নুন তেল আনাজপত্র মায় সিগ্রেট দেশলাই মোমবাতি সব নিয়ে গিয়ে সেখানে স্টক করতে হবে।

—ওই ফরেস্ট বাংলো থেকে লোকালয় প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার, মাঝে গভীর বন, নালা-পাহাড়, আর ওই বনে পায়ে হেঁটেও বেশী ঘোরা যাবে না। বুনোহাতি, বাইসন বাঘ নেকড়ে কি নেই!

ওরা দশদিনের ফর্দ টর্দও করতে থাকে।

সমরেশবাবু জানেন ওই দুই মূর্তিকে থামানো যাবে না। মাথার পোকা নড়লে ওরা যাবেই। সব শুনে সমরেশবাবু বলেন।

—সারান্দায় যাবি। তা ভালো, এই জঙ্গলের বাইরেই মাইনস্ এর ধারে বড়বিল বড় শহর, ওখানেই তো তোর কাকাবাবুর কারখানা কনট্রাকটারির ফার্ম বাড়ি। ওখানে সকলেই এক ডাকে চেনে, মনোতোষকে। নিজেরই গাড়ি জিপ, ট্রাক সবই আছে। ওকে লিখে দিই সব ব্যবস্থা করে রাখবে তোদের জন্য।

রঞ্জন কাকাবাবুর কথা শুনে চমকে ওঠে।

কাকাবাবু মনোতোষ চ্যাটার্জি ওই অঞ্চলের নামী দামী লোক। বিরাট কনট্রাকটার, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় এই অঞ্চলের বিভিন্ন মাইনস্-এর ডাম্পার, লোডার, বুলডোজার, অন্য যন্ত্রপাতি মেরামত করেন। নিজেরও বিরাট কনট্রাকটারি ফার্ম, ভাগ্য অন্বেষণ করতে ওই বন পাহাড়ে গিয়ে এখন বেশ জমিয়ে বসেছেন।

বিরাট বাগান বাড়ি জমিজায়গাও করেছেন বড়বিল শহরে। কিন্তু নিঃসন্তান, তাই মনোতোষবাবু রঞ্জনকেই বেশী ভালোবাসেন। তারজন্য তার ভাবনার উদ্বেগের অন্ত নেই।

হৈ চৈ করা তাঁর স্বভাব।

বেশ জানে রঞ্জন কাকা তাকে ওই ভাবে জঙ্গলে যেতেই দেবেন না। তাই রঞ্জন বলে বাবার কথায়।

—কাকাকে আর বিরক্ত করা কেন? তিনিও কাজের লোক। আমরাই কলেজ থেকে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টকে লিখে সব ব্যবস্থা করে নেব। বরং

জঙ্গলের বাংলো থেকে বের হয়ে ফেরার সময় কাকাবাবুর বাড়িতে ক'দিন থেকে আসা যাবে।

সমরেশবাবুও বোঝেন আজকালকার ছেলেরা সহজে কারোর কোন সাহায্য নিতে চায় না, নিজেদের উপর এদের আত্মবিশ্বাস বেশীই। তবু সমরেশবাবু বলেন।

—ঠিক আছে, তবু ঠিকানাটা নিয়ে যাবি, বিদেশ বিভুঁই জায়গা যদি কোন অসুবিধায় পড়িস জানালেই সব কিছু প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে।

অঞ্জনও বাড়িতে তার মাকে বাইরে যাবার কথা জানাতে ওর মা বলেন।

—আবার যাবি ওই বন পাহাড়ে? তোদের দুজনের কি ঘরে মন বসে না?

অঞ্জনের বাবা নেই ওর বাবা আগেই গত হয়েছেন। মা ছেলেকে নিয়ে ওদের পৈত্রিক বাড়িতে থাকে। অঞ্জনের মা অঞ্জলিদেবীও ছেলেকে ঘরবাসী করতে চান। ওর বয়সী ছেলেরা অনেকেই বিয়ে থা করে ঘর সংসার করছে, কিন্তু অঞ্জন যেন তাদের থেকেও স্বতন্ত্র।

মায়ের কথায় অঞ্জন বলে—বাইরে যাবো তাতে কি হয়েছে? প্রায়ই তো যাই।

অঞ্জলিদেবী বলে—এবার ওইটাই বন্ধ করার ব্যবস্থা করছি। ললিতাকেও বলছি এবার ছেলের বিয়ে থা দিক। তোর মামাবাবুও বলছিল ভবানীপুরের মুখুয্যেরা বড় চাপ দিচ্ছে, মেয়েটিও ভালো।

অঞ্জন বলে—ওসব ডল পুতুলকে বিয়ে করা আমার পোষাবে না মা। ওখানে বিয়ে হবে না!

কথাগুলো মাকে বেশ জোর দিয়ে জানাতে মা বলে, তাহলে নিজের পছন্দমতই বিয়ে কর।

অঞ্জন বলে—সময় হলেই হবে। এখন গোছগাছ করে দাও, ক'দিন ঘুরে আসি। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় ওসব ভাবা যাবে।

অঞ্জলিদেবী ললিতাকে চেনেন।

ছেলেদের মারফৎ দুই মায়ের পরিচয়টা ঘনিষ্টতর হয়ে উঠেছে। দুজনের যাতায়াত আছে এর ওর বাড়িতে।

অঞ্জলিদেবী তাই এসেছে ললিতার কাছে পরদিনই। ললিতা বলে।
—এসো অঞ্জলি, তুমি না এলে আমাকেই যেতে হতো। ছেলেদুটোর কথা কিছু ভাবছো?

অঞ্জলিও তাই এসেছে, বলে সে।

ভাবনার তো শেষ নেই ললিতাদি, আজকালকার ছেলে, সবকিছুই তারা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায়, বলেও তো পারিনি। হুট হাট দুজনেই পাহাড়ে বের হয়ে যায়। ভয়ে মরি! যা দিনকাল পড়েছে।

ললিতাও ভাবছে কথাটা। বলে সে।

আমিও তো কত বলছি, ওর বাবাও বলেন বিয়ে থা'র কথা। কিন্তু ছেলের মতিগতি বুঝি না। আবার তো বের হবে, এখন দিনরাত তারই প্ল্যান প্রোগ্রামই হচ্ছে। যা ভালো বোঝে করুক গে!

অঞ্জলি বলে—এবার ব্যবস্থা করবোই, তুমিও শক্ত হও।

যাদের জন্য মা বাপ-এর এত ভাবনা সেই দুই মূর্তি অবশ্য এসব ভাবনার ধারই ধারে না। তারা এখন সারান্দার অরণ্য পর্বতের স্বপ্ন দেখছে।

গোছগাছ সারা। ফরেস্ট বাংলোর রিজার্ভেশনের চিঠিও এসে গেছে। এবার টিকিট করে বার্থ রিজার্ভেশানও করেছে তারা। আর একদিন সন্ধ্যায় দুইমূর্তি বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়ে সেই পরিক্রমার জন্য।

রাতের ট্রেন। বোম্বাই লাইনে টাটানগর অবধি কোন এক্সপ্রেস ট্রেনেই আসতে হচ্ছে ওদের। রাতের অন্ধকারে এক্সপ্রেস ট্রেন ছুটে চলেছে। ঘুমও ঠিক আসে না। কারণ ট্রেনটা টাটানগরে পৌঁছবে প্রায় তিনটের পর, সেখানে নামতে হবে তাদের। অর্থাৎ ভোর রাত। যখন ঘুমটা জমিয়ে আসার কথা, তখনই নামতে হবে। তাই ঠিকমত ঘুমই আসে না।

এক্সপ্রেস ট্রেনটা টাটানগরে ভোর রাতেই পৌঁছায়, ঘুমচোখে দুই বন্ধু মালপত্র নিয়ে নেমে—প্লাটফর্মের ওদিকে অন্য কোন প্যাসেঞ্জার ট্রেনে গিয়ে ওঠে। ওই প্যাসেঞ্জার ট্রেনটা যাবে সারান্দার জঙ্গলের বাইরের সীমানার শেষ স্টেশন গুয়া অবধি। ওখানেই লাইনের শেষ, সেখানেই নামতে হবে ওদের, তারপর জিপ ভাড়া করে যেতে হবে বনের ভিতরে।

তখনও রাত্রির অন্ধকার রয়েছে।

এই ট্রেনটাকে বোধহয় রেলকর্তারা তেমন আমলই দেয় না। তাই প্লাটফর্মের ওদিকে কিছুটা নির্জনে ফেলে রেখেছে। সব কামরায় আলো ও নাই। রাতের অন্ধকারে ট্রেনটা যেন ঝিমুচ্ছে।

রঞ্জন অঞ্জন দুজনে কুলির মাথায় ব্যাগট্যাগ চাপিয়ে ছুটে ছুটে গিয়ে, উঠলো ট্রেনটায়।

বেশ ফাঁকাই রয়েছে গাড়ি। ওরা ওই গাড়িতেই মালপত্র তুলে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে। আর রাতে ঘুম হয়নি, তাই শুতেই ঘুমে চোখ বুজে আসে।

ঘুম ভাঙ্গল ওদের তখন সকাল হয়ে গেছে। গাড়ি চলেছে বন পাহাড়ের বুক চিরে। অসমতল লাল পাথুরে জমি, শাল মহুয়ার গাছ-গুলো সকালের রোদে ঝলমল করছে, জানলা দিয়ে দেখা যায় দূর দিগন্তে নীল পাহাড় আকাশের গায়ে ঠেলে উঠেছে। আর, শালবন এখনও ফিকে—তেমন জমাট নয়।

ট্রেনে আদিবাসী—স্থানীয় ভূইহার, সাধারণ মানুষের কিছু জটলা। ট্রেনটা বনের মধ্যে কোন ছোট্ট আধ ঘুমন্ত ইষ্টিশানে দাঁড়ায়। দু'চারজন দেহাতী ঝুড়িতে আনাজপত্র, লাউ, শাক-সব্জী নিয়ে উঠলো। ওরা যাবে বড়জামদার হাটে।

আবার চলছে গাড়ি, একটা পাহাড়ীনদীর ব্রিজ পার হচ্ছে চাকার শব্দ তুলে। এবার খেয়াল হয় রঞ্জনের। তার বাঙ্কে মাথার কাছে সুটকেশটা রাখা ছিল সেটা নেই। চমকে ওঠে রঞ্জন—আমার সুটকেশ?

বাঁদিকে অঞ্জনও এবার সুটকেশের খোঁজ করতে গিয়ে দেখে তার সুটকেশটাও নেই। অঞ্জন চমকে ওঠে।

—আমার সুটকেশ?

দুজনের সুটকেশই গায়েব। এদিক ওদিক খুঁজেও পায় না। ব্যাগ দুটো রয়েছে, কিন্তু সুটকেশ দুটোর কোন চিহ্নই নেই। যখন ঘুমিয়েছিল ওরা, তখনই কোন শহুরে চোর ওই মাল দুটো হাতিয়ে বেমালুম সটকে পড়েছে।

—কি হবে? অঞ্জন ঘাবড়ে যায়। বলে সে, ব্যাগে দু একটা জামা প্যাণ্ট আছে, সামান্য কিছু টাকা পড়ে আছে, বাকী তো সবই ছিল সুটকেশে।

রঞ্জনও ভাবছে কথাটা।

তার অবস্থাও তাই। যৎ কিঞ্চিৎ টাকা কিছু জামাকাপড় টুকি-টাকি জিনিস ছিল ব্যাগে, আর টিকিটগুলো তাদের সঙ্গেই রয়েছে, নাহলে আরও বিপদই হতো।

রঞ্জন ভাবছে কথাটা।

অবশ্য সামনে বড়জামদার কাছেই বড়বিল শহর। সেখানে তার কাকা বিরাট ধনী প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি। সেখানে গেলে সব সমস্যারই সমাধান হয়ে যাবে। রঞ্জন তা যেতে চায় না। তার মনে হয় যা টাকাকড়ি আছে —জামাকাপড় ইত্যাদি রয়েছে তাই দিয়েই ক'দিন সারান্দার, বন বাংলোয় কাটিয়ে তারপর ফেরার সময়, কাকার ওখানে আসবে।

ক'দিন সত্যিকার এ্যাডভেঞ্চারই করতে চায় রঞ্জন। বলে রঞ্জন—যা টাকাকড়ি—জামা কাপড় সঙ্গে রয়েছে, তাতে বন বাংলোয় চল সোজা। ক'দিন টানাটানি করে কাটিয়ে ফেরার সময় কাকাবাবুর ওখানে উঠবো। সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আগেই কাকাবাবুর কাছে গেলে এ অবস্থায় বনে যেতেই দেবেন না। সাংঘাতিক লোক তিনি। একেবারে বদমেজাজী—তাই বলছি বনেই চল। কাগজপত্রে যে তারিখ আছে তার মধ্যেই যেতে হবে। না হলে বাংলোও মিলবে না। তারপর আসা যাবে।

অঞ্জন ইতিউতি করে—টাকা পয়সা দুজনের কাছে বিশেষ তো নেই। জিপের ভাড়া—

রঞ্জন বলে—ওই ক্যাপিটালিস্ট মানসিকতা ছাড় তো, জিপে চড়তে হবে কেন ?

—বনের ভিতরে যাবি কি করে ? চল্লিশ কিলোমিটার পথ—হেঁটে যাওয়াও যাবে না ?

রঞ্জন বলে—চলতো গুয়া স্টেশনে, ওখানে ফরেস্টের ট্রাকও আসে। তাদেরই ধরতে হবে।

কি ভাবছে অঞ্জন, এমনিতে সে একটু আরামপ্রিয়—ভীতু ধরনের ছেলে। বাড়িতে ও আয়াসে মানুষ। রঞ্জন তার তুলনায়, কিছুটা বেপরোয়া জেদী আর সাহসীও। সব অবস্থার সঙ্গেই সহজে মানিয়ে নিতে পারে। সব সময়ই হাসিখুশি। বলে রঞ্জন।

—আরে এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন। এ সমস্যার সমাধান তো এক মিনিটেই হয়ে যাবে। কাকাবাবুতো রয়েছেনই, সুতরাং চল একটা নতুন এ্যাড-

ভেঙ্গারই হবে এমনি ভাবে ক'দিন বেড়িয়ে। তারপর চলে আসবো কাকাবাবুর ওখানে। টেক ইট ইজি অঞ্জন—এত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? আমি তো রয়েছি।

অঞ্জন অবশ্য জানে রঞ্জন এসব প্রবলেম সহজেই সলভ করতে পারে। সে সব উপস্থিত বুদ্ধি ওর আছে। বলে অঞ্জন—না, না ঘাবড়াবো কেন?

রঞ্জন বলে—তবে? অমন বোবা মুখ করে থাকিস না। টেক ইট ইজি, চল। দেখা যাক না নতুন ভাবে বেড়ানোটা কেমন হয়।

চিনাবাদাম বিক্রী করছিস একজন দেহাতী হকার। তার কাছ থেকে দুটো প্যাকেট কিনে একটা অঞ্জনের হাতে দিয়ে, বলে কাম অন্। এই আজকের ব্রেকফাষ্ট। নো এগ—নো টোষ্ট, পরের স্টেশনে ভাঁড়ে চা। ব্যস—

এবার ওরা সারান্দার কিছুটা গভীরেই ঢুকেছে। অতীতে এই সব অঞ্চলেও ছিল গভীর অরণ্য, বাঘ হাতির বিচরণক্ষেত্র। এখন ওই সব পাহাড়ে আয়রণ ওর, ম্যাঙ্গানীজ এসব মিলেছে, কিছু খনিও গড়ে উঠেছে। আর অরণ্যের দামী শাল, সেগুন, বাঁশ এসবের জন্যই কিছু ব্যবসায়ী এসে দু'একটা গঞ্জ শহর বানিয়েছে। লোকালয়ও হচ্ছে।

তবু এই অরণ্যের রূপই আলাদা।

যেন ধ্রুপদের গুরু গম্ভীর মূর্চ্ছনা ফুটে ওঠে এখানে, ঠুংরির হালকা চাল নয়। বেশ গমক—গম্ভীর ভাবই ফুটে উঠছে এই অরণ্যে। ট্রেনটা বনের বুক চিরে চলেছে, দুদিকে বড় বড় গাছের ছায়া অন্ধকার জড়ানো মাটিতে স্যাঁতসেতে ভাব ফুটে ওঠে। মাঝে মাঝে জমাট পাথরের দেওয়াল দুদিকে—পাথর ফাটিয়ে লাইন নিয়ে গেছে।

সামনে বড়জামদা—এই লাইনের বড় স্টেশন।

এখানে আজ হাট। ট্রেন থেকে সব লোকজনই ঝুড়ি. মাটির হাঁড়ি-কুড়ি, আনাজপত্র, মুরগীর ঝুড়ি নিয়ে নেমে পড়ে। ট্রেনটা ফাঁকা হয়ে যায় প্রায়। এর থেকে আর একটা স্টেশন গেলেই পাহাড়সীমার শুরু, লাইনও শেষ হয়ে গেছে সেখানেই।

ওদেরও যাত্রা শেষ হবে ওখানে।

ট্রেনটা এবার আরও গভীর বনের মধ্য দিয়ে চলেছে, সামনে ঠেলে উঠেছে আকাশছোঁয়া পাহাড়। সারান্দার ভিতরেই এবার এসে গেছে তারা।

ট্রেনটা এসে থেমেছে গুয়া স্টেশনে। সামনেই পাহাড়ের শুরু, গভীর শাল সেগুন ঢাকা বন। নির্জন ছোট্ট স্টেশন। ট্রেনটা এখানে থেমেছে। ঘণ্টা দুয়েক দম নিয়ে ওটা আবার ফিরে যাবে টাটানগরের দিকে।

গুয়া বাজার, কারখানা, জনবসতি একটু ওদিকে।

কয়েকজন যাত্রী নামে। রঞ্জন অঞ্জনও নেমেছে। অঞ্জন বলে—এরপর? জঙ্গলে ঢুকবো কি করে? রঞ্জন চারিদিক চেয়ে দেখছে শান্ত পাহাড়ঘেরা উঁচু-নীচু ছোট উপত্যকাকে। এখানে ওখানে দু'চারটে বাড়ি, রেলের কোয়ার্টার, একটা চায়ের দোকানও রয়েছে।

রঞ্জন বলে—চলতো বাইরে খোঁজ খবর নিই। কোন ব্যবস্থা না হলে এই ট্রেনেই ফিরে গিয়ে বড়জামদায় নেমে কাকাবাবুর বাংলোতে গিয়েই ছুটি কাটাবো। তার আগে একবার চেষ্টা করে দেখা যাক।

ওরা বের হয়ে এসেছে চায়ের দোকানে।

কিছু লোকজন রয়েছে। চা আর সস্তা কটকটে লেড়ো বিস্কুটই মেলে ওখানে। খিদেও পেয়েছে। আর কোন খাবারের সন্ধান তো নাই। ওই শুকনো লেড়ো দিয়েই চা খেতে হয়।

রঞ্জন এর মধ্যে চায়ের দোকানদারকে শুধোয়।

—থলাকাবাদ বাংলোয় যাবো বনের মধ্যে, ওদিক থেকে কোন ট্রাক এসেছে আজ?

চায়ের দোকানদার চাইল ওর দিকে।

—জঙ্গলমে যায়েগা জী? থলাকাবাদ?

চায়ের দোকানের ছেলেটা বরং দোকানদারের থেকে বেশী হুঁশিয়ার। সেইই বলে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখাতো সিংজীর ট্রাক আয়া। উধার লালাজীকা গদিকা পাশ, সিংজীকো ভি দেখা—ওহিতো ট্রাক, উধার।

ছেলেটা দেখায় দূরে একটা গুদাম—টিনের শেড, কয়েকটা বাড়ির দিকে। পাহাড়ী একটা ঝোরার ধারে দেখা যায় একটা ট্রাকও রয়েছে।

চায়ের দোকানদার বলে—ওহি তো ট্রাক!

দোকানদার বলে—যাইয়ে, ড্রাইভারকো বোলিয়ে, দেখিয়ে লে যায় ক্যা নেহি।

চায়ের দোকানের ছেলেটা বলে—হম সিংজীকো পহচনতে হে—ক্যা যাঁউ?

সেই যেচে এদের উপকার করতে চায়। রঞ্জন বলে—চলতো সোহি!

ছেলেটাই ওদের নিয়ে আসে ঝোরার ধারে।

একটা বড় আসান গাছের নীচে ট্রাকটাকে ধোলাই করছে একটা লোক। ওদিকে একটা চারপাই-এ বসে সিংজী তখন বোতল থেকে মদ ঢালছে গ্লাসে, বিশ্রী বোটকা গন্ধ ওঠে। সেই মহুয়াই গলায় ঢালছে সিংজী, সঙ্গে অনুপান বলতে কিছু চানা ভিজে, কাঁচালঙ্কাও রয়েছে।

– সিংজী!

ছেলেটাকে দেখে চাইল সিংজী।

ক্যা রে লৌন্ডা?

ছেলেটাই বলে—সাহাব লোক থলাকাবাদ বাংলোমে যায়েগা—লে যাইয়ে না আপকা ট্রাকমে।

সিংজী এবার রঞ্জন অঞ্জনের দিকে চাইল। পরণে এদের রাতের সেই দলামোচা পাকানো পোষাক। চানটান নেই উস্কো-খুস্কো চেহারা। সিংজী এদের আপাদমস্তক দেখে দর হাঁকে—পাঁচ রুপেয়া করকে দশ রুপেয়া দেনে হোগা। এরা আশা করেনি দশটাকাতেই এতটা পথ যেতে পারবে, কিন্তু ওই দশ টাকাই ওদের কাছে এখন অনেক। সবই তো চোরে নিয়ে গেছে। তাই রঞ্জন বলে।

দ-শ রুপেয়া!

পরে বেশ মালায়েম স্বরে বলে—থোড়া কম কিজিয়ে, শেষ অবধি রফা হ'ল আট টাকা। আর সিংজী হিসাবী লোক।

বলে দিজিয়ে আট রুপেয়া!

দশ টাকার নোটটা দিতে দু'টাকা ফেরৎও দেয়। কিন্তু এবার ছোঁ মারে চায়ের দোকানের ছেলেটা।

—হম্‌কো তো কুছ দো বাবুজী! সস্তামে কর দিয়া—গেল ওই দু টাকার নোটটাও। ছেলেটা নোটটা নিয়ে রোদে পরখ করে দেখে পকেটে পুরে বলে।

—অব চলে জী।

সোজা দৌড় মারলো চায়ের দোকানের দিকে এদের ফেলে রেখেই।

সিংজী তখনও বাকি বোতলের মহুয়াটা সাফ করতে ব্যস্ত। আর সেই ক্লিনার ট্রাক সাফ করে এবার ঘুর ঘুর করছে ড্রাইভারের আশপাশে তার প্রসাদের আশায়।

ড্রাইভার সিংজীও বেশ বিবেচক, বোতলের বাকীটা চ্যালাকে দিয়ে বলে—জলদি পি লে, অব যানে হোগা।

গাড়িতে তেল পোরে গাড়ি চালু রাখার জন্য, আর নিজেদের পেটে মাল পোরে নিজেদের চালু রাখার জন্য। মাল তাই চাই-ই। ড্রাইভার, ক্লিনার ফিট হয়ে এবার ট্রাক ছাড়ে।

উপত্যকার বুক চিরে পাহাড়ী একটা ছোট্ট নদী তিরতির করে বয়ে চলেছে, জল যত না আছে এতে পাথর রয়েছে তার থেকে অনেক বেশী।

শীতের শেষ—ঝরাপাতার পালা শেষ হয়ে এখন বসন্তের সাড়া এসেছে বলে, ঝোরার জলটা ও কম, বর্ষার সময় এই ঝোরাতেই নামে পাহাড়ী ঢল, তখন খরস্রোতে গেরুয়া জল বয়ে চলে, ভেসে আছে ছিটকে পড়া বনের গাছ, বুনো খরগোস, বনের সাপ।

এখন সেই মত্ত রূপ আর নেই। ট্রাকটা ওর উপরে গড়ে তোলা কনক্রিটের কজওয়ের উপর দিয়েই চলে যায়। তারপরই শুরু হয় গুয়া মাইনস্ এর কর্মচারীদের কোয়াটার গুলো, চারিদিকে ঘিরে রেখেছে উঁচু পাহাড়, এই পাহাড়ের একটা দিক একেবারে বৃক্ষহীন, লাল পাথুরে বুক সবুজ এর মধ্যে যেন ক্ষতের মত জেগে উঠেছে।

ওই দিকেই এখন আদিম পাথরের বুকে ড্রিল করে নীচে তরল অক্সিজেন দিয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পাথর চূর্ণ বিচূর্ণ করে আকরিক লোহা বের করা হচ্ছে।

ধাপে ধাপে উঁচু পাহাড়কে কেটে তার থেকে খনিজ লোহাপাথর তোলা হচ্ছে।

সেই লোহাপাথরের স্তূপগুলোকে তিনহাজার ফুট উঁচু পাহাড় থেকে কনভেয়ার বেল্টে ধাপে ধাপে নামিয়ে এনে এবার ঢোকানো হচ্ছে ক্রাশিং এবং ওয়াশিং প্ল্যান্টের বিরাট শেডে।

ওই লোহাপাথরের ছোট বড় পিণ্ডগুলোকে ক্রাশিং মেশিনে ফেলে যন্ত্রের সাহায্যে ভেঙে টুকরো করা হচ্ছে। ওই সব পাথরে প্রায় ষাট ভাগ লোহা রয়েছে, ধারালো যন্ত্রের দাঁতের চাপে একটা দানব যেন ওই পাথর গুলোকে চিবিয়ে ছোট সাইজের করছে, আর যন্ত্রের ঘর্ষণে পাথরের বুক থেকে ছিটকে আসে আগুনের ফুলকি।

সাইজকরা পাথরগুলোয় এখনও কাদামাটি মিশে আছে, তাই এবার ওদের উপর জলের পাইপ থেকে জল ছিটিয়ে কাদা ময়লা মুছে এবার

অন্য কনভেয়ার বেল্ট হয়ে এসে পড়ে রেলওয়ে সাইডিং-এ। সেখানে সারবন্দী খোলা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, নিজে থেকেই ওই মালগাড়িতে এসে পড়ছে বেল্ট থেকে ওই ধোঁয়া মোছা সাইজ করা লোহাপাথরগুলো, একটা ওয়াগন ভর্তি হয়ে গেলে চলে আসছে শূন্য আর একটা ওয়াগন, এমনি করে পুরো মালগাড়ি তৈরী করা হয় আয়রণ ওরের, তারপর ওরা চলে যায় দুর্গাপুর, বার্ণপুর, বোকারো, ভিলাই, রাউরকেল্লা নানা স্টীল প্ল্যাণ্টে।

ওই পাথরগুলো ভাঙ্গার সময় লোহাপাথরের বহু চূর্ণকনাও বের হয়, সেগুলো জলে ধুয়ে অন্যদিকে পাঠানো হয়। পরে জল বের হয়ে যায়, আর লাল জমাট ধুলো পরিণত হয় স্তূপে।

অঞ্জন বলে—ওই যে ঢিবি-ছোট গোল জমাট পাহাড়ের মত দেখছিস—ওইগুলোই সেই আয়রণ ওর-এর জমাট ধুলোর পাহাড়।

ছোট পাহাড়ের মতই দেখাচ্ছে ওই বিচিত্র লাল রং-এর স্তূপগুলোকে। এখানের বাতাসে ওঠে লাল ধুলো। মাথা—সারা গা ওই লালধুলোয় যেন ভরে ওঠে।

রঞ্জন পাথরের ব্যাপার তেমন বোঝে না। ওর জগৎ সবুজ গাছ গাছালির জগৎ। রঞ্জন বলে।

—পাহাড় কেটে পাহাড়ই বানাচ্ছে, আর গাছগাছালির দফা শেষ করে চলেছে। সবুজ সুন্দর বনকে শেষ করতে চায়, এরা এমনি করে পাহাড় বানিয়ে।

হাসে অঞ্জন, বলে সে।

—না রে, ওই গুঁড়োর পাহাড়ে আছে শতকরা সত্তর ভাগ লোহা। ওই গুঁড়ো পাথরের কেক বানানো হচ্ছে মেসিনে, একেবারে ব্রিকেট, রান্নার গুলের সাইজ। দেখা যায় ওদিকে মেসিনে রাশ রাশ গুল বানানো হচ্ছে। অঞ্জন বলে—ওগুলো তো লোহা কারখানাতে চালান যাচ্ছে। ব্লাষ্ট ফার্নেশে চার্জ করে ওর থেকেই সেরা লোহা বের হয়। টাটা কোম্পানীও নেয় প্রচুর মাল। তাছাড়া জাপান তো ওসব নেবার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়েছে এদেশে।

রঞ্জন বলে—আমরা সেই কাঁচামাল জলের দরে ওদের দিচ্ছি—আর তার থেকে তৈরী লোহার জিনিষ বানিয়ে ওরাই আমাদের পাঁচগুণ দামে বেচছে আর আমরা কিনছি।

অঞ্জন বলে—ওটা উপর মহলের ব্যাপার, কেন হচ্ছে তা জানি না। তবে যা হয়, তাই বললাম।

কারখানার ওদিকে একটা নদী বয়ে গেছে পাহাড়ের বুক চিরে অনেক নীচ দিয়ে। ওই নদীর নাম কারো। এই বিস্তীর্ণ সারান্দার জঙ্গলের বুকে রয়েছে তিনটে বড় নদী। কারো, কোয়না আর কোয়েল। সারা বনাঞ্চলে বৃষ্টিও হয় প্রচুর। সেই অফুরান জল প্রবাহ বয়ে চলে ওই তিনটে নদীর বুক দিয়ে।

সভ্যজগতের নিশানা ফুরিয়ে গেছে।

ট্রাকটা এবার চলেছে বনের মধ্য দিয়ে। বনে ঢোকার মুখে পথের উপর আড়াআড়ি একটা হালকা শাল বল্লা কাঠের তেকাঠায় ফেলা। ট্রাকটা দাঁড়াতেই বনবিভাগের কর্মীরা আসে। গাড়ির নাম্বারও লেখে—সিংজীর সঙ্গে ওদের কি কথা—হাসাহাসিও হলো। সিগ্রেট এক প্যাকেট এগিয়ে দেয় সিংজী। বনবিভাগের কর্মীরা এবার গেটের লগটা তুলে ধরে পথ করে দেয়, ট্রাকটা এবার বনের মধ্যে ঢোকে।

ক্রমশঃ বড় বড় শাল, পিয়াশাল—বাঁশ-জারুল গাছগুলো যেন আকাশে মাথা তুলেছে। সব গাছই এখানে ওই আকাশে মাথা তোলার পাল্লায় নেমেছেঁ। আমগাছকে ও চেনা যায় না। পল্লীর বাগানে ওরা ডালপালা মেলে অনেকখানি ঠাঁই জুড়ে ছড়িয়ে থাকে, কদমগাছও গ্রামে বেশ আয়াসে ডালপালা ছড়ায়।

কিন্তু এই গহন বনে ডালপালা ছড়াবার জায়গাও নেই, মাথা তুলতে হবে ঊর্দ্ধাকাশে এতটুকু আলোর জন্য, মুক্ত বাতাসের জন্য। তাই সব গাছ এখানে নিজেদের চরিত্র হারিয়ে ওই বাঁচার লড়াই এ মাথাই তুলে চলেছে।

শান্ত নির্জন অরণ্যভূমি।

শালগাছই এখানের অরণ্যে যেন রাজা। দীর্ঘ কাণ্ডগুলো সোজা উঠে গেছে। এক একটার বেড় আট দশ ফিট অবধি। কত শত বৎসর ধরে অরণ্যভূমিতে সে কত শীত বসন্ত বর্ষা দেখেছে তার নিশানা ওর কাণ্ডের অভ্যন্তরে আঁকা আছে বর্ষচক্রের বেষ্টনীতে, বাইরে থেকে বোঝার কোন উপায় নাই। কাণ্ডগুলোয় শেওলা পড়েছে, আশপাশের ছোট শাল-গাছের বাকলগুলো যেন সাপের মতো ঝুলছে। নীচে স্যাতসেঁতে কুমারী মৃত্তিকা—কিছু ফার্ণ জাতীয় গাছের ভিড়। রঞ্জন বলে—হাতিতে গাছের বাকলগুলো কিছু খেয়েছে, কিছু ওই ভাবে ঝুলছে।

পাতাঝরা শালবনে এসেছে নতুন কচি হলুদ পাতার আবরণ, শাল-ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে বনের ল্যাণ্টার্ণফুলের মিষ্টি সুবাস। ভ্রমরের দল ঘোরে মধুর সন্ধানে।

কোথায় বনটিয়া—পাহাড়ী ময়না ডাকছে, ওদের ডাক ছাপিয়ে হর্ণবিল পাখীর তীব্র চীৎকার ভেসে আসে।

আলো আঁধারির মায়াজাল বোনা অরণ্যভূমি।

ট্রাকটা চলেছে বনের সরু মোরাম-এর ফরেস্ট রোড ধরে গোঁ গোঁ শব্দ তুলে।

পথের একদিকে দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে উপত্যকায় শালবন নেই। সেখানে মাথা তুলেছে সেগুন গাছের ফাঁকা ফাঁকা বন। কেমন ওই ধ্রুপদী সঙ্গীতের ছন্দপতন ঘটেছে এখানে।

অরণ্যভূমির অপরূপ সৌন্দর্য যেন বিজাতীয় পরিবেশে কেমন বিকৃত হয়ে গেছে।

অঞ্জন বলে—হঠাৎ আবার সেগুন গাছ, কেমন যেন তাল কেটে গেল রে।

রঞ্জন বলে—ঠিকই বলেছিস। বনবিভাগ বেশ কিছু বনে শালগাছ কেটে সেখানে সেগুন প্ল্যামটেশন বানাচ্ছে! সেগুন কাঠের দাম অনেক বেশী। তাই, কিন্তু এইবন শালের বন। শাল আদিবাসীদের কাছে পবিত্র বৃক্ষ, ওরা মুণ্ডারি ভাষায় বলে সারজাম দারু। এই গাছ ওদের কাছে জীবন দায়ী—দেবতা। শাল গাছ বনে ওই গাছের শিকড় থেকেই গজায়, নতুন করে গাছ লাগাতে হয় না। শাল গাছের পাতা তুলে ওরা পাতা বানিয়ে বাজারে বিক্রী করে বেশ কিছু রোজগার করে, গরু ছাগলেরও খাদ্য, শাল গাছের আঠাও বিক্রী করে ভালো দামে। গাছতো দামীই।

তার তুলনায়, সেগুন গাছের পাতাতে কোন কাজই হয় না, গরু ছাগলেও ভালো খায় না। ওইগাছ একটিই হবে, শিকড় থেকে আপনা আপনি বংশ বৃদ্ধিও করে না। শুধু গাছ এর কাণ্ড, ডাল এসব বিক্রী করে টাকা ছাড়া আর কিছুই মেলে না।

এই গাছ বাইরে থেকে এনে লাগাতে হয়। তাই আদিবাসীরা বলে এই গাছ তাদের মাটির নয়, পরদেশী, দিখু। ওরা প্রতিবাদ করে শাল গাছ কেটে সেগুন লাগানো যাবে না। ওদের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়।

—শাল আপনা—সেগুন দিখু।

সেগুন রোপাই বন্ধ করো।

পাহাড়ের পর পাহাড় টপকে চলেছে বনের পথ।

ট্রাকটা এবার নামছে ঢালু পথ বেয়ে, নীচের দিকে মাটি আরও উর্বর, বনভূমি এখানে তাই গভীর।

কয়েকটা ময়ূর ঝটপট করে উড়ে গেল। কোথায় পাখী ডাকছে দূরে, ঝর্ণার কলকল শব্দ ওঠে।

রঞ্জন গাইছে—

—চঞ্চল হে—আমি সুদূরের পিয়াসী—
রৌদ্র মাখানো অলস বেলায়
বনমর্মরে ছায়ারও খেলায়—

ট্রাকটা এসে নেমেছে একটা পাহাড়ী ঝোরায়, কাদায় বসে গেছে চাকা, ইঞ্জিনের গর্জন ওঠে, তবু চাকা ওঠে না। চাকাটা ঘুরছে, গাড়ি অনড়।

সিংজী বারবার চেষ্টা করেও গাড়ি তুলতে পারে না।

পিছনে ট্রাকের উপর রঞ্জন অঞ্জন তখন বনশোভায় মুগ্ধ হয়ে গান গেয়ে চলেছে।

সিংজী গর্জে ওঠে—আবে এই সুরদাসকো বাচ্চা।

—ওদের খেয়াল নেই। দুজনে বনরাজ্যের অপরূপ রূপে মুগ্ধ। সিংজীর ওই মধুর ভাষা তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি।

তাদের গান চলেছে।

এবার সিংজী তারস্বরে চীৎকার করে ওঠে।

—আরে এ লৌন্‌ডা, গানা বনধ্‌ করকে দেখ্‌—গাড্ডি ফাঁস গিয়া।

উতার বে।

এবার ওই উদারা মুদারা ছাড়িয়ে তারার আদিম বজ্রনাদে রঞ্জনদের খেয়াল হয়। গাড়ি ফেঁসেছে বনের মধ্যে কাদায় জলে, কোনমতে গাড়ি তুলতে না পারলে সমূহ বিপদ। বনে আটকে থাকতে হবে। আর এ বন কবিতার ফুলফোটা উপবন নয়, এখানে হাতি, বাঘ-এর রাজ্য তা বুঝেছে। আশপাশে ঝুড়ি ঝুড়ি হাতির লাদ ও পড়ে আছে সর্বত্র, মনে হয়, এই অরণ্যে ওই মহাপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র।

রঞ্জন, অঞ্জনও নেমেছে, সিটকে ক্লিনার বলে, হাত লাগাও জী! ঠেলো—জোর সে।

ওরা ঠেলছে ট্রাকটাকে, ক্লিনারটা ডালপালা [illegible] চাকার তলায় রাখে। ইঞ্জিনও চালু করে সিংজী, এরাও ঠেলছে প্রাণপণে, ইঞ্জিনের

টানে চাকাটা নড়ছে—হঠাৎ একটু উঠে সেই চাকাটা বেগে সুদর্শন চক্রের মতো ঘুরতে থাকে, ছিটকে ওঠে লাল কাদা জল এদের সর্বাঙ্গে, গায়ে মুখে মাথায়।

ক্লিনার গর্জায়—ঠেলো জী! জোর সে—আউর থোড়া।

ওই অবস্থাতেই ঠেলতে হয়।

হাঁপাচ্ছে এরা। এমন কাদাজলে গাড়ি ঠেলার অভ্যাসও নাই। আর খাওয়াও হয় নি এখনও। কিন্তু উপায় নেই।

সিংজী ও অশ্রাব্য ভাষায় যা বলছে তা লেখার অযোগ্য, এই গহন বনে প্রতিবাদ করার উপায়ও নেই।

টাকাও গেছে আবার কুলিগিরিও করতে হচ্ছে।

কোনমতে ঠেলে ঠুলে গলদঘর্ম অবস্থায় ট্রাকটাকে তুলে ওরা কোনমতে ওঠে, আবার চলছে গাড়ি।

কাদাজল ধোয়ার সময়ও পায়নি। কোনমতে হাত মুখ ধুতে পেরেছে মাত্র।

জলে কাদায় পড়ার জন্যই বোধ হয় গাড়িটা ঈষৎ বিগড়ে গেছে। বেশ খানিকক্ষণ উৎরাই-এর পথে চলার পর একটা ছোট্ট আদিবাসী বস্তি দেখা যায়। চারিদিকে ঘন বন, বিশাল শাল জারুল—পিয়াশাল গাছের জটলাময় পাহাড়—মধ্যে একটু ছোট্ট উপত্যকার এদিক ওদিকে কিছু ধান—মকাই—গহুর ক্ষেত, কিছু সরষেও হয়েছে। একটা উঁচু মাচায় বসে কারা ওই ফসল পাহারা দিচ্ছে—এখানে ওখানে ছড়ানো রয়েছে দু'একটা কুঁড়েঘর মতো।

দু' চারটে আধন্যাংটো আদিবাসী শিশুও দেখা যায়, অবাক হয়ে ধাবমান ট্রাকের দিকে চেয়ে আছে তারা।

রঞ্জন বলে—এই গভীর বনেই এরা থাকে।

অঞ্জন শোনায়—কিভাবে থাকে কে জানে? একেই বলে মানুষ আর প্রকৃতির সহাবস্থান, এদের শহরে নিয়ে যাও—পালিয়ে আসবে। এই আরণ্যক পরিবেশে বিপদ এখানে পদে পদে, বাঁচার লড়াইও তীব্র, তবু এরা বেঁচে আছে।

স্তব্ধ আরণ্যক পরিবেশে বাঁশীর সুর ওঠে।

ঝোরার ধারে কয়েকটা গরু চরাচ্ছে একজন ছেলে, পরনে একটু নেংটি, তাতেই খুশি সে, সেই খুশির সুর ওঠে ওর বাঁশীর সুরে।

রঞ্জন বলে—জীবন সম্বন্ধে ওদের ধারণাটা স্বতন্ত্র। ওদের চাহিদাও সামান্যই, তাই বোধহয় ওরা খুশি। আমাদের মতো আকাশছোঁয়া চাহিদা নেই, হাহাকারও নেই।

আবার পাহাড় ঠেলে উঠছে ট্রাকটা।

আর শুরু হয় ইঞ্জিনের গোলমাল, থেমে যাচ্ছে গাড়ি, আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ। একদিকে নেমে গেছে গভীর খাদ অন্যদিকে খাড়া পাহাড়।

চীৎকার করে সিংজী।

—আবে উতার, ঠেল—জলদি কর তুসি।

আবার নামো, ঠেলো গাড়ি।

দম বের হয়ে যায় গাড়ি ঠেলতে। আগে ছিল কাদা এখন লালচে ধুলো।

মাথা গায়ে ধুলোর আস্তরণ পড়েছে।

ঘামছে ওরা গাড়ি ঠেলতে, তবু ঠেলার বিরাম নাই।

গাড়ি স্টার্ট নিতেই লাফ দিয়ে ওঠে, নাহলে ওই সিংজী নামক বিচিত্র ব্যক্তিটি এই জঙ্গলে ফেলে রেখেই উধাও হবে।

অঞ্জন বলে—কি হাল হয়েছে দ্যাখ, একেবারে আদিবাসী কুলি বনে গেছি। এরপর কোথায় থাকা, কি খাওয়া জুটবে কে জানে?

রঞ্জন বলে—বাংলোর চিঠি রয়েছে, ঠাঁই ঠিকই পাবি! আর ডালভাতও জুটবে।

—কিন্তু কখন? বেলা একটা বাজতে চললো!

রঞ্জন শুধোয় ক্লিনারকে।

—আউর কিতনা দূর থলাকাবাদ?

লোকটা এদিক ওদিক চেয়ে বলে—আভি দূর হ্যায়, চুপচাপ বৈঠিয়ে, অর্থাৎ এখন তাকে বিরক্ত যেন না করে ওরা।

ট্রাকটা কোনমতে চলেছে বনের বুক চিরে, কোথায় চলেছে কে জানে।

মেজর রিপুদমন গাঙ্গুলি এককালে মিলিটারীর জবরদস্ত অফিসারই ছিলেন। বিরাট দশাসই চেহারা—মাথায় এক গাছি চুল তার নেই, বেশ পরিষ্কার ঝকঝকে টাক—নীচের দিকে দু' একগাছি কেশ খুঁজলে মিলতেও পারে, ওই চকচকে টাকে রোদ আর ঠাণ্ডা বড় রিএ্যাক্ট করে, আর অনেকেই হাসে চকচকে টাক দেখে তাই ফোরেজ ক্যাপ দিয়ে সবসময় মাথা ঢেকে রাখেন।

মাথার চুল নাইবা রইল, সেই ক্ষতিটা পুষিয়ে দিয়েছে এক জোড়া বিশাল গোঁফ, বিড়ালের রোমশ ল্যাজের মতো পুরুষ্ট, আর তেমনি নধর। মেজর সাহেব মাঝে মাঝে মোম লাগিয়ে গোঁফ জোড়াকে বেশ ছুঁচলো করে তোলেন।

মিলিটারীতে খুবই দাপট ছিল, ক্যাপ্টেন লেফটন্যাণ্ট সবাই ওর তর্জন-গর্জনে ঘাবড়ে যেতো, জবরদস্ত সিপাইরাও তটস্থ হয়ে থাকতো মেজর সাহেবের হুঙ্কারে, যেন কাঁচা খেগো দেবতা। সেবার তো কোন যুদ্ধ ক্ষেত্রে একা মেজর গাঙ্গুলির গুলি গোলা নয়, স্রেফ হাঁকারির ভয়ে প্রতি-পক্ষের সেনারা নাকি ব্যাঙ্কার ছেড়ে এসে আত্মসমর্পণ করেছিল। হুঙ্কার তো নয় মেঘের গর্জন, বজ্রের নির্ঘোষ।

কিন্তু এহেন মেজর গাঙ্গুলি তার কোয়ার্টারে এলে গিন্নীর হুঙ্কারে তখন নেংটি ইঁদুর বনে যায়। সুরূপা গাঙ্গুলি স্বামীকে ধমকায় চুপ করো! নো টক!

দুঁদে মেজর থেমে যায়।

অবশ্য দোষ মেজর সাহেবের কিঞ্চিৎ আছে। সেটা ঈষৎ পান দোষ। অবশ্য এর জন্য মেজর গাঙ্গুলির দোষ সবটা নয়, মিলিটারীদের সরকার মনোরঞ্জনের জন্য সস্তায় মদ সরবরাহ করে। আর মেজর একা নিজের পারমিট ছাড়াও আরও কয়েকজনের পারমিট সংগ্রহ করে মদটা একটু বেশী পান করেন।

মাঝে মাঝে রেসের বুকিও আসে ক্যানটনমেণ্টে।

দমকা বেশ কিছু টাকা পাবার জন্য ঘোড়ার বাজিও ধরেন, খবর নাকি চলে আসে এখানেও, সিওর খবর। তাই বাজীও ধরেন মোটা টাকার।

কিন্তু সে ঘোড়া কোনদিকে দৌড়ে পালায় কে জানে—ফার্ষ্ট সেকেণ্ড কদাপিও হয় না।

ফাঁক থেকে মেজর সাহেবের বেশ মোটা টাকাই গচ্ছা যায়।

এদিকে মিলিটারী অফিসার, ঠাটবাট বজায় রেখে চলতে হয়। স্ত্রী সুরূপা গাঙ্গুলি তো মেমসাহেবই। রূপ কোনকালে ছিল তা মনে নাই মেজর গাঙ্গুলির, এখনও সেই প্রসাধনের ঘটা বেড়েই চলেছে। মা একা নন তার দুটি কন্যাও রয়েছে।

সুরূপা মেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে অতি আধুনিকা বানাতে চায়

যাতে সেরা ছেলেরাই আসে তাদের জন্য। মিসেস গাঙ্গুলি তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম তরুণদেরই বেছে নেবেন মেয়েদের জন্য।

মেজর গাঙ্গুলি অবশ্য সংসারের কথা তেমন ভাবেন না। ভাবার সময়ও তাঁর নেই। চাকরী তার চেয়ে বেশী মন দেন পার্টিতে, মদ্যপান তার স্বভাবেই পরিণত হয়েছে। তাই খচরাও বাড়ছে। এদিকে সংসারে ওই উগ্রমূর্তি মিসেস গাঙ্গুলি তিনি মেয়েদের রীতিমত মেমসাহেব বানাতে ব্যস্ত, গাড়ি চাই নিজের, তার খরচ আছে।

ফলে মেজর গাঙ্গুলি রেস খেলেই ভাগ্য ফেরাতে চান—অবশ্য ঘোড়ার ল্যাজে টাকা বাঁধলে সে টাকা আর ফিরে আসে না। ল্যাজের ঝাপটায় কোনদিকে অদৃশ্য হয়ে যায়।

মেজর গাঙ্গুলিরও সেই অবস্থা ঘটে।

টাকা চাই—আরও টাকা। ফলে মিলিটারী সাপ্লায়ারদের উপরই এবার চাপ দিতে হয়।

তারা ব্যবসায়ী লোক, ব্যবসার লেনদেনের হিসাবটা বেশ ভালোই বোঝে। তাই টাকা তারা দেয় আর অদৃশ্য পথে মাল চালানের কাগজেই সই হয়, সেই মাল স্টোরে ঠিকমত যায় না।

অথচ মোটা টাকার বিলও পাশ হয়ে যায়।

মেজর গাঙ্গুলির সংসার ঠাটে বাটেই চলে মিসেস গাঙ্গুলির নেতৃত্বে। কড়াধাতের মহিলা ওই মিসেস তরুলতা গাঙ্গুলি। বিলেতের ধারে কাছেও যায়নি জীবনে।

কিন্তু বিলেতী স্টাইলটা তার যেন মজ্জাগত হয়ে গেছে। খানাপিনা চালচলনও একেবারে বিলাতী মেমসাহেবদের মতই।

মেয়েদেরও সেইভাবেই মানুষ করতে চান তিনি।

কিন্তু গোলবাঁধে সেইখানেই। বড় মেয়ে আইভি একেবারে মায়ের বিপরীত ধরনের মেয়ে। এবার কলেজে ভর্তি হয়েছে, কিন্তু জিনস্ বা গাউন পরবে না। একেবারে সেকেলে মেয়েদের মতো শাড়ি পরেই কলেজে যায়।

ছোট মেয়ে বেবী এবার স্কুল ফাইনাল দেবে, সেও দিদির দেখাদেখি শাড়িই পরতে চায়, কিন্তু মিসেস গাঙ্গুলি বলেন—ওইসব শাড়ি ফাড়ি ছাড়। দেখিস না অন্য মেয়েরা কেমন স্মার্ট! অমনি স্মার্ট হতে হবে—জিনস্ নিদেন সালোয়ার পাঞ্জাবীই পরবি। ইংরাজীতে কথা বলবি—ইংরাজী তো জানিস!

বাড়িতে পার্টিও দেয় মিসেস গাঙ্গুলি মাঝে মাঝে। অন্যদের পার্টিতে যায়, সুতরাং নিজেদের প্রাধান্য আভিজাত্য দেখাবার জন্য পার্টিও দেয় মাঝে মাঝে নিজের বাংলোর লনে।

ক্যাটারিং-এর বুফে সিস্টেমে খাবার আয়োজনও করা হয়। আর থাকে আইভি, বেবীদের গানের অনুষ্ঠান, ক্যানটনমেণ্টের কিছু অফিসার, বিশেষ করে আইবুড়ো ট্রেনিং অফিসারদের উপর মিসেস গাঙ্গুলির নজর বেশীই থাকে। তাদের দু'চারজনকে নেমতন্নও করা হয়।

হৈ চৈ চলে, নাচগানও, মেজর গাঙ্গুলিও বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন দ্রব্যগুণে।

এসব হৈ চৈ পছন্দ হয়না আইভি'র।

ওই বিদেশী নামটাই তার পছন্দ নয়, বাবা মা জোর করে ওই বিদেশী নাম, বিদেশী উৎকট কালচার মায় অর্গান বাজিয়ে বিদেশী গানের জ্বালা তার উপর চাপাতে চায়।

আইভি দেখেছে মদ খেয়ে ওই অফিসার ভদ্রলোকরা কেমন যেন জানোয়ার হয়ে ওঠে।

ছোট বোন বেবীরও ভাল লাগে না।

সেদিন পার্টিতে গাইতে হবে আইভিকে। মিসেস গাঙ্গুলি চান আইভি ইংরেজি গান গাইবে, কিন্তু দেখা যায় আইভি একেবারে শাড়ি পরে সামান্য প্রসাধন করে এসেছে। খোপায় একটা রজনীগন্ধার শীষ, একেবারে সেকেলে ভেতো বাঙ্গালী মেয়ের বেশ, আর গানও গায় রবীন্দ্রসঙ্গীত।

মিসেস গাঙ্গুলির মাথা যেন কাটা যায়।

ভেবেছিলেন মিসেস গাঙ্গুলি আজকের পার্টিতে নিমন্ত্রিত ক'জন মারাঠি, গুজরাতি অফিসারদের মাথা ঘুরিয়ে দেবে আইভি ইংরাজী, হিন্দী গান গেয়ে।

ওদের মধ্যে কোন ছেলে আইভি'র প্রেমেই পড়ে যাবে। তারপর নিপুণ হাতে জাল গুটিয়ে তুলবে মিসেস গাঙ্গুলি।

মেয়েদেরও এই ভাবে ভালো ছেলেদের ঘাড়ে চাপাতে পারবে।

কিন্তু সব বরবাদ করে দিতে চায় আইভি।

পার্টি ভাঙলো অনেক রাত্রে।

অতিথিরা চলে গেছে, লনে ছড়ানো রয়েছে বাসি ফুল—চেয়ারগুলো

ছত্রাকার করা। মেজর গাঙ্গুলি বেশী মাত্রাতেই পান করে তখন একটা সোফায় এলিয়ে পড়ে আছেন।

মিসেস গাঙ্গুলি বলে মেয়েকে।

—তোর জন্য আমার মাথা কাটা যাবে? কত গেষ্ট এসেছিল আর তুই কিনা ওই শাড়ি পরে—আধবুড়ি সেজে প্যানপানানি বাংলা গান গাইলি? এতটুকু স্মার্ট হবি না? নিজের আখের গুছিয়ে নিতে জানিস না? কত ভালো ছেলে এসেছিল—

আইভিও চেনে তার মা জননীকে। বলে আইভি--ওসব বিদেশী গান আমার ভালো লাগে না। বেহায়ার মতো কে না কে তাদের সঙ্গে হৈ হল্লা, নাচ এসব ভালো লাগে না মা।

মিসেস গাঙ্গুলি চটে ওঠে।

—তা কেন লাগবে? নিজের ভালো বুঝতে শেখ—নাহলে শেষে পস্তাবি। বাবার মুরোদ তো ওই। বুঝতে শেখ।

আইভি বলে—বুঝে কাজ নাই।

মা মেয়ের ঔদাসীন্যে হতাশই হয়। বেবীকে বলে—তুইও কি দিদির পথেই চলবি? তাহলে বরাতে দুঃখ আছে, বুঝলি। নিজের আখের গোছাতে শেখ। যা বলি তাই কর।

দুঃখটা যে হঠাৎ এমনি করে সত্যি সত্যিই এসে পড়বে তা ওরা ভাবতেও পারেনি। বেশ চলছিল মিসেস গাঙ্গুলির রাজ্যপাট। গাড়ি—বাংলো—আর্দালি, সমাজে প্রতিষ্ঠা সবই ছিল। কিন্তু এমনি করে মেঘ-মুক্ত নীল আকাশে বাজ নেমে আসবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি মিসেস গাঙ্গুলি।

মেজর গাঙ্গুলি তো নানা পথে টাকা কামাই করছিল।

খবরটা হাওয়াতে ভেসে যায়, মিলিটারী এলাকাতে সবারই চোখ কান খোলাই থাকে।

তাই ব্যাপারগুলো প্রকাশ পেতে দেরী হয় না।

তারপর উপর থেকে এনকোয়ারীও হয়ে যায় আর বেশ কিছু গোপন খবরও ফাঁস হয়ে পড়ে।

মেজর গাঙ্গুলি এতদিন ধরে নানা অসৎ উপায়ে বেশকিছু টাকা রোজগার করেছে, নানা বে-আইনি কাজ-কর্মও করেছে, ক্ষতি করেছে সরকারের।

বিভাগের কিছু লোককেও হাতে আনতে পারলে একই চালানে তিনগুণ সরেশ কাঠ একভাগ দামে মিলে যায় অনায়াসে। এছাড়া বনে আরও অনেক ধান্দাও চলে।

সর্বেশ ইদানীং বেশকিছু বন অঞ্চলেও যাতায়াত শুরু করেছে। তার লাভও বাড়ছে ওই চোরাই পথে ব্যবসা করে। সর্বেশ সোজা পথে নয় অন্ধকার পথে অনায়াসেই অনেক কিছু পেতে চায়।

তাই এখানে এসেছিল জমির লোভে, কিন্তু মিসেস গাঙ্গুলির অমায়িক ব্যবহার তাকে মুগ্ধ করেছে। আর আসলে ওই আইভিকে দেখে সর্বেশের লোভী মন আজ নতুন কিছু পাবার স্বপ্ন দেখে।

বেবী বলে-- কি হ'ল? খান। চা যে জুড়িয়ে গেল।

মিসেস গাঙ্গুলি বলে—আইভি আর এককাপ চা করে আন।

সর্বেশ বাধা দেয়—আবার ওকে কষ্ট দেবেন।

আইভি বলে—তাতে কি হয়েছে। চা-টা আনছি বসুন।

মিসেস গাঙ্গুলিই আসল কথাটা বলেই জমির ব্যাপারে জানায়—জমি তোমাকে দিতে আপত্তি নেই বাবা। নতুন বাজার থেকে শশীবাবুরাও এসেছিল। পঁচিশ হাজার দর দিয়েছিল কাঠা।

চমকে ওঠে সর্বেশ! শশীবাবুর নাম তার জানা।

তাকে এই জায়গা পেতে দেবেনা সে। সর্বেশ বলে।

—ওরা তো সব নেবে না! আমি সব নেব—সব জমি।

ওই দরেই নেব, আর আপনাদের দুটো ফ্ল্যাট দেব—বাড়তি।

মিসেস গাঙ্গুলি হিসাব করছে।

—কিন্তু এখুনিই বিক্রী করা যাবে না। শরিকান সম্পত্তি—

পার্টিশন করাতে হবে।

সর্বেশের হাত সর্বত্রই পেঁছে। সে বলে।

—কাগজপত্র সব করিয়ে জমা করিয়ে দেব—মনে হয় মাস দুয়েকের মধ্যেই ওসব হয়ে যাবে। তারপরই বিক্রী করবেন।

আর আগাম যদি কিছু চান এখন দিতে পারি।

মিসেস গাঙ্গুলি কিছু বলার আগেই টাকার গন্ধ পেয়ে এবার মেজর গাঙ্গুলি বলেন।

—তা মন্দ নয়। এ্যাডভান্স দিতে পারো—

মিসেস গাঙ্গুলি জানে তার স্বামীকে। বলে সে।

—এখন ওসব থাক। আগে এদিকের আইনগত ঝামেলা মিটুক, তখন কথা হবে।

সর্বেশ বেশ বুঝেছে মহিলা জালে জড়াতে চান না।

ওই জমি ঝামেলামুক্ত হলে প্রচুর দামই পাবে। ওগুলো তাকেই পেতে হবে।

তাই সর্বেশ সেদিন শুধুহাতে ফিরে গেলেও এবাড়িতে আসা তার বন্ধ হয় না।

প্রায়ই সময় পেলে আসে।

আর মেজর গাঙ্গুলির জন্য থলেতে করে নিয়ে আসে মদের বোতল, কখনও স্কচ-এর বোতলও এসে যায়। মেজর চৌধুরী খুব খুশি।

মিসেস গাঙ্গুলির জন্য সর্বেশ আনে বিদেশী শাড়ি—পারফিউম—এটা সেটা। মেয়েদের জন্যও উপহার আনতে ভোলে না।

আইভি বুঝেছে সর্বেশের মনের ইচ্ছাটা কি ?

স্কুলে পড়াতে যায় সে, গানের টুইশানিও করে। বাইরের জগতটাকে চিনেছে সে, সেই সুবাদে ওই সর্বেশের বাড় বাড়ন্তের খবরটাও জানে। আরও শুনেছে তার ওই প্রচুর রোজগারটা কি ভাবে হয়েছে।

সর্বেশকে তার ভালো লাগে না।

ওরা যেন সমাজের ভুঁই ফোড়, গজিয়ে উঠেছে কোন রক্তবীজের মত, ওরা দু'হাত ভরে শুধু সব কিছু পেতেই চায়।

সোজা পথে না পেলে অন্যপথই ধরবে।

তাই বাড়িতে আসে। বাবার সঙ্গে এখন খুবই বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। কেন তা জানে আইভি, আর মাকেও হাতে এনেছে। সংসারে অযাচিত ভাবে টাকা দেয়, দামী উপহার আনে সর্বেশ।

মিসেস গাঙ্গুলি সেজেগুজে সর্বেশের গাড়ি নিয়ে পার্ক ষ্ট্রীটে চুল কাটতে যায়, মার্কেটিং করতে যায় নিউ মার্কেটে। আইভিকে বলে।

—চল। সর্বেশ এত করে বলছে।

আইভি বলে—সন্ধ্যায় গানের টুইশানি আছে।

সর্বেশ বলে ওঠে—ওসব এবার ছাড়ো তো !

মিসেস গাঙ্গুলি বলে—সর্বেশ প্রায়ই বলে গান-এর টুইশানি ছাড়। আইভি, জবাব দেয় না। সে বের হয়ে যায়। সর্বেশকে এড়িয়ে গেল এই ভাবে।

বেবীও দেখে ব্যাপারটা।

মিসেস গাঙ্গুলি বলে—মেয়ে দিন দিন বেয়াড়া হয়ে উঠেছে। সর্বেশ বলে—না, না। আইভি ভালো মেয়ে ওর সম্বন্ধে ওসব কেন ভাবছেন, মাসীমা। লক্ষ্মী মেয়ে।

তরুলতা গাঙ্গুলি দেখছে সর্বেশকে। মনে মনে স্বপ্ন দেখে আইভির যদি বিয়ে দিতে পারে ওই সর্বেশের সঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ-এর ভাবনা আর তাদের ভাবতে হবে না।

মেজর তো থেকেও না থাকা। সংসারের কথা, মেয়েদের কথা তার ভাবার সময় নেই। এবার তাকেই ভাবতে হবে।

কথাটা ভেবেছে ওই সর্বেশও।

ক্রমশঃ সেও যেন আইভি'র দিকে ঝুঁকেছে। এবার তাই সে বুঝেছে শহরে এই পরিবেশে ওই জেদী মেয়েকে বশে আনা যাবে না সহজে।

তাই অন্য এক পরিবেশেই নিয়ে যাবে ওদের—যেখানে আইভিকে একান্তে পাবে। ওর মনের কাছাকাছি আসতে পারবে।

আর সেই সুযোগও মিলে যায় সর্বেশের।

এর আগেও সে কাঠের ব্যবসাতে নেমে সারান্দার জঙ্গলে কয়েকবার যাতায়াত করেছে। সেখানের কিছু লোককে সে হাতেও এনেছে, আর তাদের দিয়ে প্রচুর কাঠ নানাভাবে এনে মোটা টাকা লাভও করেছে।

এবার সেখানেই একটা মজবুত ঘাঁটি গড়েছে সর্বেশ। শুধু দামী কাঠই নয়, একটা বাঘের চামড়া ঠিকমত পাচার করতে পারলে লাখখানেক টাকা লাভ আসে, হাতির দাঁত তো সোনার চেয়েও দামী—বাইসনের, সম্বর, বারোশিঙার শিং-এর দামও কয়েক হাজার টাকা।

ওসব বহুমূল্যবান দ্রব্য সেখানে ঠিকমত লোক রাখলে প্রচুরই মেলে। সবদিক থেকে বনের ব্যবসা লক্ষী ব্যবসা। সেখানে ঘাঁটি গেড়েছে সর্বেশ স্রেফ টাকার জোরে।

ওটা অন্ধকারের জগৎ।

আলোর জগতে সর্বেশ গাঙ্গুলি পরিবারের কাছে আপনজন। এ-বাড়িরই যেন একজন হয়ে উঠেছে সে।

স্কুলের গরমের ছুটি পড়েছে!

সেদিন সর্বেশ এসেছে মেজরের বাড়িতে। মেজর সাহেবকে টেস্ট

করতে দেয় রিয়েল স্কচ হুইস্কি। মেজর সাহেব বহুদিন পর স্কচ পেয়ে খুব মুডে রয়েছে।

মিসেস গাঙ্গুলির জন্য এনেছে সর্বেশ ঢাকাই আসলি জামদানী। একথা সেকথার পর বলে সর্বেশ।

—এই দমদমের গিঞ্জিতে আর ভালো লাগছে না।

মিসেস গাঙ্গুলি ও হাঁপিয়ে উঠেছে, বলে সে।

—তা সত্যি! মনে হয় কিছুদিন কোথাও থেকে কাটিয়ে আসি। আইভি'র স্কুলেরও ছুটি বেবীরও পরীক্ষা হয়ে গেছে। কিন্তু কোথায় বা যাই?

সর্বেশ বলে—চলুন না দারুণ জায়গা—সারান্দা ফরেস্ট। সুন্দর বাংলো আছে বনের মধ্যে, ঝর্ণার ধারে। চারি দিকে উঁচু পাহাড়—সবুজ শাল মহুয়ার বন।

মেজর গাঙ্গুলি মহুয়ার নাম শুনে বেশ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

—মহুয়ার বন? তাহলে মহুয়া নিশ্চয়ই হয়। দারুণ—জিনিস। সর্বেশ জানে কোন দেবতা কোন ফুলে তৃপ্ত হয়। আর সেইমত যোগানও দেয় সে। মেজরের কথায় বলে।

—হ্যাঁ, রিয়েল মহুয়া মেলে সেখানে। একেবারে অরিজিন্যাল।

গাঙ্গুলি বলে—দেন ইটস্ এ রিয়েল গুড প্লেস। সুন্দর জায়গা।

মিসেস তবু আমতা আমতা করে।

—বনের মধ্যে থাকতে হবে? বাঘ—হাতি এসব ও আছে শুনেছি। বেবী এমনিতে ডাকাবুকো ধরণের মেয়ে। সে বলে ওঠে।

—তাতে কি! ওরা থাকবে বনে, আমরা থাকবো বাংলোয়।

ব্যস! তাই চলুন সর্বেশদা বনের গল্পই শুনেছি এবার বন দেখেই আসবো। বাঘ হাতী এবার দেখা যাবে তো?

সর্বেশ বলে—দেখা যাক কি দেখতে পাও, চলো তো।

সর্বেশ মিসেস গাঙ্গুলিকে বলে।

—কোন অসুবিধা হবে না। দারুণ বাংলো। চৌকিদারের লোকই খানা বানিয়ে দেবে। গাড়ি থাকবে—বাইরে থেকে বাজারপত্র সবই করে নিয়ে যাবো। একেবারে সবুজ প্রকৃতির মধ্যে ক'দিন কাটিয়ে আসবেন। গাড়িতে যাবো—গাড়িতেই ফিরবো। ওখানে সবাই চেনা জানা, কোনও অসুবিধে হবে না।

একেবারে দারুণ আউটিং। আর স্রেফ বিনি পয়সায়।

মিসেস গাঙ্গুলিও রাজী হয়ে যায়।

বেবীও খুশি, ওই দারুণ জায়গাতে যেতে পারবে সে।

আর মেজর সাহেব তো এখন থেকেই মহুয়াসুন্দরীর প্রেমে পড়ে গেছে। বলেন তিনি।

— মিলিটারীর কোড কি জানো? যেতে হবে—ব্যস! নো টক্।

এ্যাটেনসন! ফরোয়ার্ড মার্চ! লেফট রাইট—লেফট্—

আইভি সবই শোনে।

বেবীও খুশিউছল কণ্ঠে বলে।

—চল দিদি, দারুণ জায়গা। বনে কখনও যাইনি তুই আর অমত করিস না। ঘুরে আসি।

আইভি বলে—বনের জানোয়ারদের তবু বিশ্বাস করা যায়। ওদের ক্ষতি না করলে তারা কিছু করবে না। কিন্তু মানুষ জানোয়ার যদি বুনো হয়ে যায় তারা তখন হিংস্র হয়ে ওঠে। তাদের বিশ্বাস করা যায় না।

বেবী জানে দিদির ব্যাপারটা।

মা-বাবা চান সর্বেশকে হাতের মুঠোয় আনতে নিজেদের স্বার্থেই। তাই দিদিকেই যেন টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চায়।

দিদি তা চায় না। ওই সর্বেশকে দিদির রুচিশীল মন কোনদিনই মেনে নিতে পারবে না। মা সে কথা একবারও ভাবে না।

বেবী বলে—তোর ব্যাপারটা বুঝি রে দিদি।

চাইল আইভি বোনের দিকে। বেবী বলে।

—দেখবি কৌশলে ওই লোভী লোকটাকে ঠিক একদিন মুখের মত জবাব আমিই দেব। তুই চল—আমিতো আছি। সহজে কোন ক্ষতি তোর হতে দেব না। মায়ের ওই সব চক্রান্ত ঠিক ব্যর্থ করে দেবই। আমার উপর ভরসা রাখ।

আইভি আর আপত্তি করেনি। বেবীর বড় ইচ্ছা বনে যাবে সে। বোনের ওই ইচ্ছাতেই সায় দেয় আইভি।

সর্বেশও খুশি হয়। মনে হয় আইভি'র মনের জমাট বাধার প্রাচীরটা ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়বে। তার জন্য সর্বেশের দু'নম্বরী টাকা যা যাবে—ওই বনে গিয়ে সর্বেশ তার চারগুণ টাকা রোজগার করবে, আর ফাউ হিসাবে পাবে ওই আইভিকে। তাই বনে যাবার সব আয়োজনই করে সর্বেশ।

আর কয়েকদিন পর তারা টানা গাড়িতে বের হয় কলকাতা থেকে ওই দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে সারান্দার দিকে।

প্রথম দর্শনেই বন বাংলোকে ভালোবেসে ফেলে মিসেস গাঙ্গুলি, বেবী, আইভিও।

বনে এর আগে তেমন আসেনি। দীর্ঘ গভীর বন পাহাড়ের মধ্য দিয়ে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ওরা এসে পেঁাছে বনের মধ্যে সবুজ এই উপত্যকায়।

ওদিকে টিলারের গায়ে ছড়ানো বন বিভাগের কর্মীদের কোয়াটার, ফরেস্ট অফিস, গুদাম এদিকে উপত্যকায় একটা ছোট্ট পাহাড়ী নদী বয়ে গেছে তার ধারে কিছু আদিবাসীদের বস্তি। রাস্তার ধারে ফরেস্টের চেক পোস্ট নাকা। একটা বাঁশ আড়াআড়ি ভাবে ফেলে রাখা হয়েছে পথের উপর।

কাঠ বোঝাই ট্রাক গুলোকে এখানে আটকে চেক করা হয়। তাদের পারমিট, অন্য কাগজপত্র দেখে, তারপর, যেতে দেওয়া হয় বাইরে।

তার ওদিকে ওই আদিবাসীদের বস্তি। একপাশে কয়েকটা বেশ পুরানো শাল মহুয়ার গাছ, ওরই নীচে সারবন্দী পাতার ঝুপড়িতে সপ্তাহে একদিন হাট বসে।

অতীতে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট বন সংরক্ষণ, ভূমিক্ষয়, বনসৃজন এসব কাজের জন্য এই গভীর বনের মধ্যে এসব কাজ করাবার জন্য কিছু আদিবাসীদের এইখানে এনে ঘর তৈরী করে বসত করিয়েছিল। ক্রমশঃ লোকালয় গড়ে উঠেছে। আদিবাসীরা বনের বাইরে জমিতে কিছু ধান মকাই এসবের চাষও করে, ঘরের লাগোয়া জমিতে কিছু আনাজপত্র, পেঁপে কুমড়োও তৈরী করে।

গভীর বনের মধ্যে হঠাৎ কিছু ফাঁকা উপত্যকায়, এই ছোট্ট লোকালয়—মানুষ জন, গরু বাছুর, দেখে একটু নিশ্চিন্ত হয় মিসেস গাঙ্গুলি, বলে। ওরে বাবা, বন আর পাহাড়, দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। এর যেন শেষ নেই। এখানে তবু লোকজন—বাড়ি দেখে বাঁচলাম।

মেজর গাঙ্গুলির মেজাজটা বিগড়ে রয়েছে।

বহুক্ষণ গলা ভিজানো হয়নি, বন আর পাহাড়ই দেখেছে। তবু লোকালয় দেখে আশ্বস্ত হয়। এত লোকজন যখন রয়েছে পানীয় ও নির্ঘাৎ মিলবে, মহুয়া গাছেরও অভাব নেই।

বেবী বলে—সর্বেশদা, আমরা কি বন পার হয়ে গেলাম ?

সর্বেশ বলে—না, না। এটাকে বনের কেন্দ্রস্থলই বলতে পারো। ওদিকে আরও গভীর বন আছে। মাঝখানে এইটুকুই ফরেস্ট রেঞ্জ অফিস, কিছু বসতি রয়েছে।

ফরেস্টনাকার ওই গেটের সামনে এদের জিপ দাঁড়িয়েছে, চৌকিদার কাগজপত্র দেখছে, রাস্তার উপর একটা টিলা উঠে গেছে। টিলার গায়ে ফরেস্ট অফিস।

কে একজন বের হয়ে আসে, সে তো চেনে সর্বেশ চৌধুরীকে।

—নমস্তে চৌধুরী সাব্।

—নমস্তে রাই সাব্—খবর সব ঠিক বা? সর্বেশও দেশওয়ালী টানে ওই বনরক্ষীর সঙ্গে কথা বলে।

সর্বেশই বলে—দু-চার রোজ বাংলোমে ঠারেগা, মেহমান লোগ্‌কো সাথ!

ফরেস্ট বিট অফিসার বসন্ত প্রকাশ রাই বলে।

—পারমিশন তো মিল গিয়া!

—হ্যাঁ। একটু মদত করবেন মেহেরবানী করে।

—জরুর! রাই বলে—ঐ তো হামারা ডিউটি হ্যায়। যাইয়ে বাংলো মে। কোই প্রবলেম হোগা তো বলিয়ে। পিছু ভেট হোগা জী।

গেট পার হয়ে গাড়িটা চলেছে, লোকালয় প্রায় শেষ।

রাস্তার ওদিকে একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় গাছ-গাছালির ফাঁকে এবার দেখা যায় বাংলোটা।

ছোট নদীর উপর কাঠের ব্রিজ পার হয়ে রাস্তাটা টিলার গা বেয়ে উঠে চলেছে। পথের ধারে বোগেন ভিলা, ল্যাষ্টার্ণা, গুলগুল, গোলগোলি গাছের ভিড়। কোনটায় লাল, কোনটায় আকাশী রং-এর ফুল ফুটে আছে। বাতাসে ওঠে বনবাসী ফুলের মদির সুবাস।

ঘুরপাক খেয়ে পথটা এসে উঠেছে পাহাড়ের মাথায়। পাহাড়ের মাথাটা সমতল করা। সেই প্রশস্ত সমতলে গড়ে তুলেছে সুন্দর বেশ বড় বন বাংলো—এর গঠনশৈলীটা তো বেশ পুরোনো, আর এতে ব্রিটিশ যুগের স্থপতির বেশ বনেদীয়ানার ছাপ তো রয়েছে।

বাংলোর স্থান নির্বাচন, নির্মাণ এসব হয়েছিল ব্রিটিশ আমলেই। তাই বাংলোর ঘরে ফায়ার প্লেসে, ধোঁয়া বের হবার চিমনি এসবও রয়েছে।

পাশাপাশি খান পাঁচেক ঘর—লাগোয়া বাথরুম, ওদিকে মালী, ড্রাইভার, কর্মচারীদের থাকার জন্য আউট হাউস, পাশে কিচেন ষ্টোর

সবই রয়েছে। পিছনে একটা গোবর গ্যাসের প্ল্যাণ্ট। ওতে গোবর দিয়ে গ্যাস তৈরী করা হয়। সেই গ্যাসে বাতি জ্বলে বাংলোয়, অবশ্য হ্যারিকেন হেসাকও আছে।

বাংলোর সামনে পাহাড়ের চূড়াটাকে সমতল করে ধাপে ধাপে টেরাস গার্ডেন করা হয়েছে। নানা মরশুমি ফুলের গাছ, বেশ কিছু সরেস জাতের গোলাপও হয়েছে।

লাল-সাদা-বেগুনি নানা রং-এর ফুলের বাহার জায়গাটাকে রঙ্গীন করে তুলেছে।

জিপটা এসে থামে বাংলোর সামনে।

দীর্ঘ সময় ধরে তারা গাড়িতে এসেছে, হাত-পা যেন জমে গেছে। আর লাল ধুলোয় ভরে উঠেছে মাথা--সারা গা।

গাড়ি থেকে নামছে আইভি, বেবী, মিসেস গাঙ্গুলি।

আইভি দেখছে চারিদিকে মাথা তুলেছে উঁচু পাহাড়, বনে ঢাকা—আর সামনে ওই সাজানো বাগান—ফুলের বাহার দেখে আইভি'র দুচোখ খুশিতে ভরে ওঠে, উচ্ছসিত কণ্ঠে বলে।

ও—সুন্দর, অপূর্ব !

বেবীও ততক্ষণে বের হয়ে বাগানটা দেখছে।

ওদিকে একটা বসার জায়গা, কাঠের মজবুত পাটাতন দেওয়া রেলিং ঘেরা। কয়েকটা বসার জন্য বেঞ্চও আছে। বাতাসে ঝর ঝর শব্দ ওঠে। ওই শব্দ মিশেছে বনের বাতাসের সুরে।

বেবী ওদিক থেকে ডাকে।

—দেখবি আয় দিদি, কি সুন্দর পরিবেশ !

আইভি এগিয়ে যায় ওই বসার জায়গাতে।

নীচে মজবুত শাল খুঁটি দিয়ে ওই জায়গাটা বানানো।

নীচে এসে ঠেকেছে লম্বা শালগাছের প্রান্তভাগ—গুচ্ছ গুচ্ছ শাল ফুলের মঞ্জরী বাতাসে মাথা নাড়ে, আরও নীচে দেখা যায় সেই নদীটা পাথরে পাথরে আছড়ে পড়ে সুর তুলে চলেছে।

বাংলোর সামনে বেশ কিছুটা জায়গার বনভূমি কেটে সাফ করা রয়েছে, সবুজ ঘাসের গালিচা বিছানো, দুচারটে কলমী, আম, লিচু, কাঁঠাল গাছও দেখা যায়। এ বনে তারা পরদেশী।

ওই খোলা প্রান্তটার পরই শুরু হয়েছে গভীর বনঢাকা পাহাড়-সীমা।

এ যেন এক স্বপ্নের দেশ, ফুলের রাজ্য—শান্ত স্তব্ধতার জগৎ। শহরের সেই কলরব, কোলাহল এখানে বিন্দুমাত্র নেই। আইভি যেন কি শান্তির আশ্বাস পায় এখানে।

বেবী বলে—জায়গাটা কিন্তু দারুণ রে দিদি, চার্মিং! দেখেই আমি প্রেমে পড়ে গেছি।

আইভি বলে—দেখিস, সত্যি সত্যি আবার প্রেমে পড়িস না?

বেবী বলে—কার সঙ্গে পড়বো? চারিদিকে শুধু গাছ আর পাথর।

বাংলোর চৌকিদার ওদের জন্য দু'খানা ঘর খুলে দেয়। সর্বেশ বলে,

—আর একটা ঘর মিলবে না?

চৌকিদার বলে—বুকিং আছে সাব্।

সর্বেশ বলে—কেউ তো নেই!

চৌকিদার জানায়—এসে পড়বে। তাই ঘর আর এখনই দিতে পারবো না সাব্। একটা ছোট ঘর আপনার জন্য, আর একটা বড় ঘর চার বেডের ওই বুকিং ছিল আপনার, দিয়েছি।

সর্বেশ জানে কোন্ পুজোর কি মন্ত্র। তাই পকেট থেকে একটা কুড়ি টাকার নোট বের করে বলে।

—এটা রাখো। আর ওপাশে একটা ছোট ঘর দুই বেডের ব্যবস্থা কর দিদিমণিদের জন্য। পিছু বাত হোগা। সমঝা?

অর্থাৎ আরও কিছু প্রাপ্তিযোগ হবে।

আর তার পথও দেখেছে চৌকিদার। ওকেই এদের খানার ব্যবস্থা করতে হবে। মালপত্র এরাই এনেছে।

সর্বেশ বলে—একজন রান্নার লোকের ব্যবস্থা করো—আর একজন বেয়ারা চাই, এটা সেটা ফাইফরমাস শুনবে।

চৌকিদারকে তার জন্যও বেশ কিছু টাকা দেয়।

এমন রসাল পার্টি, সুতরাং ওদিকের আরও একটা ঘর পেয়ে যায় তারা, ওখানে উঠলো আইভি আর বেবী, এদিকে মেজর গাঙ্গুলি সস্ত্রীক, এপাশে সর্বেশ। ওদিকে বাংলোর আর দু'খানা ঘর খালি রইল। সেখানে নাকি কোন্ পার্টি আসবে।

ওরা যেন না আসে।

সর্বেশ এণ্ড কোম্পানীই তাহলে শান্তিতে বাংলোটা পুরো দখল করে থাকবে।

এর মধ্যে চৌকিদারের লোক বাথরুমে জল দিয়েছে। ওরা স্নান সেরে এবার খাবার ব্যবস্থা করছে। এবেলায় বাইরের কোন শহর থেকে আনা ব্রেড, বাটার, আণ্ডা, কলা আর সন্দেশ দিয়েই কোনমতে খাবার সারতে হবে।

কারণ রান্নার লোক এখনও এসে হাজির হয়নি।

চৌকিদার রান্নার লোক, কাজের লোকের সন্ধানে ওই আদিবাসী বস্তির দিকে গেছে।

মেজর গাঙ্গুলি বলেন চৌকিদারকে।

—আদমী জরুর লানা, আউর দু'চার বটলিয়া মহুয়া—একদম অরিজিন্যাল। বুঝলে সর্বেশ, ধুলো পায়েই একটু টেষ্ট করতে হবে, গা-গতর টাটিয়ে গেছে।

চৌকিদারকে আবার কিছু টাকা দেয় সর্বেশ। বলে,

—সাব্ কা লিয়ে দেখো ক্যা মিলে!

আমদানী ভালোই হয় চৌকিদারের। ওর টাকার দরকার ছিল, ক'দিনের জন্য দেশে যাবে। যাহোক কিছু মিলে গেল তার।

মিসেস গাঙ্গুলি দেখছে চৌকিদারের আনা আদিবাসী মূর্তিটিকে। বেঁটে সাইজের। চোখ দুটো আধবোজা। চৌকিদার বলে।

—বাংলোতে সাবলোক এলে এই শনিচরিই খানা পাকায়। এইই আপনাদের খানা পাকাবে।

সর্বেশ বলে—কাজের লোক?

চৌকিদার তার টাকাটা এর মধ্যে পুরা গায়েব করেছে। বলে সে।

—দু তিনদিন পর কামকা আদমী মিলবে। আভি গঁহু কাটাই চলছে, গঁহু না তুলে কেউ ভি আসবে না। সে ক'দিন বাংলোর মালীকেই বলবো—

মিসেস গাঙ্গুলী শুধোয় শনিচরিকে।

—খানা পাকাতে জানো? চাউল, রোটি, তন্দুরী, চিকেন, সব্জী···

শনিচরি ঘাড়ই নাড়ে—জী—জী।

আইভি, বেবীও দেখছে ওদের। ক'দিন এখানে ওদের ঘর বসতের পালাই শুরু হয়েছে।

সর্বেশকে বের হতে হবে কাজে।

এখানের কোন বিশেষ এলাকায় তার বিশেষ কাজ আছে। সর্বেশ বলে মিসেস গাঙ্গুলিকে।

—তাহলে আপনি দেখে শুনে ওকে দিয়ে রাতের খানা বানাতে বলুন, আমি একটু ঘুরে আসছি।

তাকে এখানে তার লোকজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হবে। মেজর গাঙ্গুলি চৌকিদারের আনা তাজা মহুয়া পেয়ে বেশ মুডেই রয়েছেন।

বলেন মেজর—ভেরি গুড স্টাফ হে। একটু ট্রাই কর সর্বেশ, অরিজিন্যাল—নির্ভেজাল মহুয়া।

সর্বেশ হুঁশিয়ার লোক। যখন তখন ওসব সে খায় না। তার এখন অনেক কাজ। সর্বেশ বের হয়ে গেল জিপ নিয়ে বনের দিকে।

বনের কোন কোন অঞ্চলের সরেস গাছ প্রতি বছরই কিছু কাটাই হয়। পুরানো গাছগুলোকে বনবিভাগ থেকে মার্কা দেওয়া হয়, সেই সব মার্কা দেওয়া গাছ কাটাই করে বনের ঠিকাদাররা, আর পরে বনবিভাগ থেকে সেইসব কাঠ মাপ করে দর দাম করা হয়। সেই দাম মিটিয়ে দিলে তবেই সেইসব কাঠ ট্রাকে করে বাইরে আনতে পারে ঠিকাদাররা।

গভীর বনের মধ্যে ওই বন কাটাই করার জন্য কাঠ কাটার লোকজনও আছে। তারা হাতি বাঘ-এর রাজ্য ওই বনের গভীর কোন পাহাড়ী ঝোরার ধারে অস্থায়ী পাতার কুঁড়ে বানিয়ে বাস করে।

পানীয় জল, স্নান করার জল মেলে ওই পাহাড়ী নদীর থেকেই। আর রাতে কাঠের গুঁড়ির আগুন জ্বালিয়ে রাখে বন্যপ্রাণীদের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য।

ওই বনের মধ্যে বাস করে তারাও যেন মানুষ নামক এক আরণ্যক শ্রেণীর প্রাণীতেই পরিণত হয়েছে।

তাদের কিছু লোক এই কাঠকাটা ছাড়াও অন্য কাজও করে। রাতের গভীরে বুনো দাঁতাল হাতি, বাঘ-নেকড়ে-হায়না এসবও মারে।

ওই হাতির দাঁত, বাঘের চামড়া বেশ দাম দিয়ে নেবার লোকও আছে।

সর্বেশ-এর জিপটা বনের পথ বেয়ে শুকনো পাতা মাড়িয়ে বনের গুঁড়ি পথের ধারে এদের বসতের ওদিকে এসে থামে।

ভিখ্নুয়াসর্দার দেখেছে সাহেবকে। কাঠের মহাজনকে সে চেনে।

সেদিন সবে বৈকালে ওর কাঠ কাটার জায়গা থেকে ফিরছে। নটবর বেহারা এগিয়ে যায়।

—সেলাম সাব।

সর্বেশ বলে চাপাস্বরে—মাল সব ঠিক মত গেছে নটবর ?

নটবর জানে মাল কিভাবে পাচার হয়।

বনবিভাগের দু'একজন পেটোয়া লোক আছে তাদের, ওই মার্কামারা কাঠের সঙ্গে বেমার্কা কাটা দামী রোজউড-মেহগিনি কাঠও পাচার করে তারা। একই পারমিটে মার্কা না দিয়ে কিছু টাকার বিনিময়ে দু-তিন চালান মালও পার করে দেয়।

আর বে-আইনী কাটাই তো চলেই।

বনভূমির সেই সবুজ প্রশান্তিকে এমনি চক্রান্ত করে তারা লুট করে চলে।

সর্বেশকে বলে নটবর।

—দো-তিন চালান মাল গেছে সাব্। আজ সকালেও এক ট্রাক মাল গেছে।

সর্বেশ মনে মনে লাভের হিসাবটাও কষে নেয়।

তবু শুধোয় সে—শুধু কাঠই যাচ্ছে ? হাতির দাঁত—বাঘের দু' একটা চামড়া যে চাই।

নটবর কি ভাবছে।

তার সন্ধানে কিছু মাল রাখা আছে, তবে ভালো দাম তার চাই।

তাই বলে—দেখছি সাব্, যদি মিলে যায় দেব। লেকিন জ্যাদা দাম মাংতা হ্যায় উলোক।

সর্বেশ বলে—কত চায়, কি মাল এসব খবর ন্যাও, তারপর মাল পেলে দাম ঠিকই দেব। আরও কাঠ তৈরী রাখো, কিছু বেশী মাল পাঠাতে হবে।

—লেকিন নয়া ফরেস্ট অফিসার আয়া, বহুৎ কড়া আদমী।

হাসে সর্বেশ, ওসব কর্মচারীদের সে চেনে এই গহন বনে আসে মোটা টাকা রোজগারের জন্যই। ওদের কি করে বশ করতে হয় তা জানে সর্বেশ। তাই বলে।

—তুমি ফিকির মাৎ করো। মাল দাও—সব বন্দোবস্ত আমি করে নেবো।

কিছু টাকাও দেয় লোকটাকে, বনের আড়ালেই ওই লেন-দেন আর ষড়যন্ত্রও হয়ে যায় মাল পাচারের।

ভিখুয়াসর্দার এই অরণ্য অঞ্চলের কোন আদিবাসী বস্তির মানুষ। এই অরণ্যভূমিই তার ঘর। এখানেই সে মানুষ হয়েছে। ভালোবাসে এই অরণ্যকে।

আগেও বন কাটাই হতো।

আবার বনের যত্নও নিত বনবিভাগ। পাহাড়ের বুক জুড়ে শালচারা —বুনো ঘাস—নানা কিছু গাছ রোপাই করা হতো। সবুজ হয়ে থাকতো বনরাজ্য। রকমারি জন্তু-জানোয়ার, কতরকম পাখীদের কলরব উঠতো অরণ্যভূমিতে, হরিণের পাল ঘুরতো বনে বনে কালো ডাগর চোখের চাহনি মেলে, পাহাড়ী ময়নার ঝাঁক কলরব করতো। আজ তারাও নেই।

তাদের ডুংরির বন ওই লোভী কাঠ মহাজনের দল কেটে সাফ করে ন্যাড়া করে দিল। রাতারাতি সব কাঠও পাচার হয়ে গেল। ওদের ডুংরির ঝোরোটাও শুকিয়ে গেল।

আর জলধারা প্রবাহিত হয় না। ক্ষেতের ফসলও মরে গেল জলের অভাবে। পাহাড়গুলোর বুকে গাছ—ঘাস অবধি নেই, বৃষ্টির জলে মাটি ধুয়ে ধুয়ে কেবল পাথরগুলোই কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে রইল।

ডুংরির মানুষজনের পেটে ক্ষিদে, জমিতে ফসল নাই, ঝোরায় জল নাই। লুটেরার দল তাদের সব কিছু লুট করে তাদের নিঃস্ব করেছে। তাই ভিখুয়াসর্দারের গ্রাম বসত উঠে গেল, সর্দার তার দলকে বাঁচাতে পারলো না।

কেউ শহরে গেল—কেউ না খেয়ে মরলো, আর ভিখুয়াও তার কিছু লোকদের নিয়ে গাঁ বসত ছেড়ে পেটের দায়ে সেই কাঠ মহাজনদের কাছেই আজ কাজ করছে।

নিজের বাঁচার জন্য ওই সর্বনাশা কাজ করে চলেছে।

দেখছে কাঠমহাজনরা কিভাবে চোরা কাটাই করে আর বনের কিছু লোভী কর্মচারীকে হাত করে বন কেটে সাফ করে চলেছে। শুধু কাঠ, গাছই নয়, বনের প্রাণীদেরও এরা গুলি করে, না হয় তীব্র বিষ দিয়ে মারছে। হাতির দাঁত, বাঘ, সাপ, হায়না, মায় শিয়ালের চামড়াও এদের কাছে অনেক টাকার মাল।

সেসব মাল এরা পাচার করছে। সর্বনাশ করছে অরণ্যভূমির। ভিখুয়া নীরবে দেখে আর তার সারা মনে যেন আগুন জ্বলে ওঠে। ওই পরদেশী দিখুরা যেন বনে আসে তাদের বনভূমি, বন্যপ্রাণী—এমনকি তাদের মেয়েদের সর্বনাশ করার মতলব নিয়েই।

ওই সর্বেশ চৌধুরীই তাদেরই একজন।

নীরবে সে ব্যাপারটা দেখে মাত্র।

বাংলোতে সন্ধ্যা নামছে।

পাহাড়ের আড়ালে সূর্য ঢলে পড়তেই ক্রমশঃ আলো ফিকে হয়ে যায়। তারপর নামে সন্ধ্যার অন্ধকার।

পাখীদের কলরব ওঠে। শান্ত নির্জনে সন্ধ্যার রূপই আলাদা।

কেমন যেন নিঃসঙ্গতাও নামে চারিদিকে।

আইভি, বেবী আর মিসেস গাঙ্গুলি বাংলোয় এই তিনটি প্রাণীই রয়েছে। সর্বেশ তখনও ফেরেনি।

আর গাঙ্গুলি সাহেব তো মহুয়ার প্রেমে তখন আত্মহারা।

ওদিকে আউট হাউসে শনিচরি আর কার গলা শোনা যায় মাত্র। উনুনে আগুন জ্বলছে। চারিদিক ঘিরে আঁধার নামে, আকাশের আঙ্গিনায় ফুটে ওঠে তারা ফুলগুলো—উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকে ওদের দীপ্তি।

নীচের সমতলেও তারার বিন্দু জ্বলে।

চৌকিদার বলে—হরিণের পাল চরছে ওখানে। মা জী, সন্ধ্যার পর আর বাইরে থাকবেন না। ই বন বহুৎ খতরনক। পিছুকা জঙ্গলমে হাতি-শের-বরা-ভালু সব কুছ হ্যায়। মহুয়াকা সিজন—ভালুভি মহুয়ার ফুল খেতে বাহার আসে। আপলোক অন্দর যাইয়ে, দরজাভি বন্ধ কর দিজিয়ে।

অর্থাৎ বাইরে থাকা আর নিরাপদ নয়, সুন্দর ফুল দিয়ে সাজানো বাংলোটা যেন বিপজ্জনক হয়ে ওঠে সন্ধ্যার পর।

মেজর সাহেব বিড় বিড় করে।

—হাম হাতি, শেরকা নেহি ডরতা! গোলিসে উড়া দেগা!

আনে দো!

মিসেস গাঙ্গুলি ধমকে ওঠে পতিদেবতাকে।

—থামো তো। তোমার বীরত্ব দেখা আছে। ভিতরে চলো।

ঘরের ভিতরে সামান্য আলোয় কেমন গা ছমছম করে।

তখনও সর্বেশ ফেরেনি। মিসেস গাঙ্গুলি বলে।

—মরতে এই বনবাসে কেন এলাম !

মেজর বলে—ভেরি গুড প্লেস, গুড মহুয়া !

—মরণদশা ! মিসেস গাঙ্গুলি গজগজ করে।

ওদিকে আইভি আর বেবী জানালা দিয়ে দেখছে ওই রাতের তারাকিনী বনজগৎকে। নীচে হরিণের দল চরছে, বাতাসে সেই ঝোরার শব্দটা ভেসে আসে।

শান্ত স্তব্ধ অপরূপ এক প্রশান্তিময় জগৎ। আইভি'র মনের সেই অহেতুক আশঙ্কটাও যেন তুচ্ছ হয়ে গেছে।

তার গলায় আজ সুর জাগে।

অনেকদিন পর যেন মন খুলে কি তৃপ্তিতে গাইছে সে। বেবীও মুগ্ধ হয়ে দিদির গান শুনছে।

শান্ত পরিবেশে সুরটা ওঠে।

মেজর মাথা নাড়ে—না, সুপার গায় আইভি ! ভেরি নাইস।

মিসেস গাঙ্গুলির মনে হয় মেয়েটা যেন এখানে এসে আজ মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। ভালো লেগেছে এই জগৎ।

এই ভালো লাগা মন নিয়ে যদি সর্বেশকে দেখতে পারে আইভি। হয়তো তাদের জীবনের সব সমস্যারই সমাধান হবে।

মেজর মনে মনে স্বপ্ন দেখে সর্বেশের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে আইভি'র।

সন্ধ্যার পর মেজর একাই বসেছে মদের বোতল নিয়ে। সর্বেশ তখনও ফেরেনি। এই বনেও তার কি এত কাজ রয়েছে কে জানে ? থাকুক সর্বেশ তার কাজ নিয়ে। মেজর সাহেবের বোতল জুটলেই খুশি।

ড্রইং রুমে ওদিকে দরজা বন্ধ করে বসে আছে ওরা।

মিসেস গাঙ্গুলি একটা কার্ডিগান বুনছে—সব সময় বোনা তার নেশা।

মেজরের চোখে গোলাবী নেশার আমেজ।

সর্বেশ তার সুখ-সুবিধার দিকে নজর রাখে, শুধু তারই নয় গাঙ্গুলি পরিবারের সকলের জন্যই তার দরাজ দিল। মেজর গাঙ্গুলি চাকরী জীবনে এদিক ওদিক করে প্রচুর রোজগার করে ঠাটে বাটেই থাকতো। কিন্তু সঞ্চয় কিছুই করতে পারে নি, তাই হঠাৎ চাকরী চলে যাবার পর

কলকাতায় ফিরে বিপদেই পড়েছিল মেজর—হাতে তেমন মালকড়ি নাই, ঠাট-বাট বজায় রাখা মুস্কিল, এমন সময় সর্বেশের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।

আর সর্বেশও এই পরিবারটিকে কেমন নিজের করে দেখে। ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠে, সর্বেশই হল তাদের এখন আপনজন।

অঢেল পয়সা সর্বেশের মেজর তা জানে, আর বেশ দিলদার ছেলে সর্বেশ। মেজর প্ল্যান করেছে আইভি'র সঙ্গে ওর বিয়েটা দিতে পারলে মেজরের আরাম আয়েস মদ্যপান এসব ঠিক মত জুটবে।

কিন্তু গোল বাধায় মাঝে মাঝে আইভি।

আইভি বি. এ. পাশ করেছে অনার্স নিয়ে। তারও বোঝার বয়স হয়েছে। বেশ জেনেছে আইভি তার বাবার মনোভাবটা, মা অবশ্য ততটা আগ্রহ প্রকাশ করে না সর্বেশ সম্বন্ধে, কিন্তু সে যে অরাজী নয় তা জানে আইভি।

অথচ আইভি'র সর্বেশকে মোটেই ভালো লাগে না। কেমন যেন মোষের মত চেহারা, স্বভাবটাও তেমনি। লেখাপড়ার ধার ধারে না সর্বেশ, সে চেনে পয়সা। পয়সার জন্য সব কিছু করেছে এতদিন।

আর কিছুই চেনে না।

আর মদ্যপান করলে যেন বদলে যায়। ভয় করে তখন ওকে আইভি'র।

অমনি একটা দেহসর্বস্ব—কুরুচিকর মানুষকে মেনে নিতে পারে না আইভি। তাই এড়িয়ে থাকার চেষ্টা করে। এর মধ্যে দু' একটা স্কুলে চাকরীর দরখাস্ত দিয়েছে সে। আশা করছে ফিরে গিয়ে কোন চাকরীই পাবে।

মেজর গাঙ্গুলির চোখে নেশার আমেজ। রাত হয়েছে, সর্বেশও রাতের অন্ধকারে তার মালপত্র পাচার করার ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফিরেছে।

মিসেস গাঙ্গুলি বলে—খাবার দিতে বলি।

সর্বেশই ডেকে হেঁকে কিচেন থেকে চৌকিদার তস্য সহকারী শনিচরিকে তোলে, অবশ্য তোলাটা সহজকর্ম নয়, দুজনেই তখন রান্না-ঘরের কাঠের আগুনের কাম মহুয়াসুন্দরীর প্রেমে আকণ্ঠ হাবুডুবু খাচ্ছে। বার কয়েক হাঁক-ডাকের পর চোখ খোলার চেষ্টা করে চৌকিদার।

—কোন!

সর্বেশ বলে—আরে বাবা আমি, হ্যাম!

চৌকিদার এবার চেয়ে দেখে কিঞ্চিৎ ঠাওর করতে পারে।

—সাব্ !

—হ্যাঁ, খানা লাগাও !

খানা সে নামেই।

টেবিলে কোনরকমে দুই মূর্তি লটপট করে এনে খাবার রাখে।

খাবার দেখেই তো মিসেস গাঙ্গুলি আঁৎকে ওঠে।

চাপাটি ইয়া পুরু, ফাটা ফাটা আর আধ কাঁচা।

কোনটা পুড়ে কালো হয়ে গেছে। ডাল খানিকটা রেঁধেছে—তা একেবারে চাপ বেঁধে গেছে। আর সব্জীতে মুখ দিয়ে শিউরে ওঠে—যেমন বিষ ঝাল আর তেমনি নুন। মুখে দেবার উপায় নাই।

মাংস এনেছিল সর্বেশ, কিন্তু সে মাংস নয় যেন রবার, সেদ্ধ হয় নি—দাঁতে দিলে স্লিপ খেয়ে হড়কে যায়।

সর্বেশ বলে—একি চৌকিদার, এই রান্না !

চৌকিদার বলে—কাঁহে, শনিচরি বহুৎ বড়িয়া রসুই করে।

বড়িয়া খানা !

মেজর গাঙ্গুলি মিলিটারীতে থাকলে ওদের দুটোকেই এতক্ষণ কোর্ট মার্শাল করতো। চাকরী নেই তবু মেজর পদবীটা আছে, তাই কথায় কথায় বন্দুক তোলে, এ হেন মেজর গর্জে ওঠে।

—রাবিশ ! এই তোমার বড়িয়া খানা ? এ খেলে তো পেট খারাপ হয়ে মরতে হবে।

মিসেস গাঙ্গুলি বলে—ওসব খেয়ে কাজ নেই, পাঁউরুটি মাখন জ্যাম আছে তাই খেয়েই রাত কাটাও।

রাতভোর ওই খেয়েই কাটাতে হ'ল।

অবশ্য দেখা যায় চৌকিদার শনিচরি দুজনেই ওই সব খাবার অনায়াসে শেষ করে আরামে ঘুমুচ্ছে মহুয়ার প্রসাদে।

এদের ঘুম আসে না। খিদেটাও চনচনিয়ে ওঠে।

সকালে মিসেস গাঙ্গুলি আইভিকে নিয়ে কিচেনে গিয়ে দেখে সব জিনিসপত্র ছত্রাকার করে ছড়ানো। শনিচরির দেখা মেলে না, কাঠের আগুনে রান্না করার অভ্যাসও নাই, মা মেয়ে নাকের জলে চোখের জলে হয়ে চা-টা বানায়।

সকালে চায়ের টেবিলে বসে টোষ্ট, বাটার, জ্যাম, আণ্ডা সেদ্ধ, কলা এসব চাই মেজরের।

কিছুই নাই, শুধু চা বিস্কুট।

আর চৌকিদার এতক্ষণে এসে জানায়—আমার দেশের বাড়িতে বৌ-এর অসুখ। খবর পেয়ে আজই দশদিনের ছুটিতে মুলুক যাচ্ছি।

চমকে ওঠেন মেজর গাঙ্গুলি।

—সে কি! তাহলে খানা পাকানো, বাংলোর কাজ এসব কে করবে?

চৌকিদার নিরুত্তর। চাপে পড়ে শেষে বলে।

—আপনারা বিট অফিসারকে বলুন। শনিচরি রইল—ও যা হয় করবে।

মিসেস গাঙ্গুলি কিছু বলার আগে মেজর ফুঁসে ওঠে।

—না খেয়ে মরতে হবে এই জঙ্গলে? কি ব্যাপার সর্বেশ?

মিসেস গাঙ্গুলিও প্রমাদ গণে—কি হবে?

সমস্যার কথা।

আইভি বলে—ক'দিন খিচুড়ি খেয়েই থাকবো।

মেজর গর্জে ওঠে—খিচুড়ি। হরিবল। সর্বেশ ডু সামথিং। না হলে আমিই দেখছি দ্যাট বিট অফিসারকে, কোন ব্যবস্থা না করলে ডি.এফ-ওর কাছে কড়া রিপোর্টই করবো। আই এ্যাম মেজর রিপুদমন গাঙ্গুলি। পাকিস্তানী সোলজারদের টাইট করেছি, দ্যাট বিট অফিসার তো শিশু।

মেজর নিজেই ধরাচূড়া পরে, বুকে মেডেল ঝুলিয়ে বন্দুকটা কাঁধে নিয়ে বের হয়ে গেল।

বিপদে পড়েছে মিসেস গাঙ্গুলি।

পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। খেতে তো হবে, সে শহরেই হোক আর বনবাসেই হোক। শহরে তবু হোটেল রেস্তোঁরা আছে।

খাবার কিনতে পাওয়া যায় নিজের পছন্দ মত, আর শহরে খিদেও কম হয়। কিন্তু বনে খিদেটাও বেড়ে ওঠে কিন্তু খাবার মেলে না তেমন কিছু। যা মেলে ফল-মূল তাতে আদিবাসীদের খিদে কিছু মেটে। সভ্য মানুষের খিদে মেটে না।

কাঠ জ্বালাও কম হ্যাপার কাজ নয়।

চৌকিদার স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য করতে চলে গেছে, শনিচরিরও পাত্তা নাই। কোথায় গেছে কে জানে।

আইভিই জল টেনে এনেছে টিলার নীচে ওই ঝোরা থেকে। বেবীও অবশ্য সাহায্য করেছে। সে আবার বেশী আয়েসী, দু' বালতি জল তুলতে তার নরম হাতে ফোসকা পড়ে।

সর্বেশ কাঠ ফাড়াই করেছে কুড়ুল দিয়ে।

আর মিসেস গাঙ্গুলি এবেলা খিচুড়িই রেঁধেছেন। ওনলি খিচুড়ি। তাতেই আলু কপি সব ফেলেছে।

মেজর গাঙ্গুলি বীরদর্পে ফরেস্ট অফিসে গেছে। তাদের বাংলোর টিলা থেকে নেমে ঝোরা পার হয়ে কিছুটা আসতে হয়। অফিস এলাকায় আসতে গেলে, একটা টিলা থেকে নেমে কিছুটা এসে আবার অন্য টিলাতে উঠতে হয়।

নীচে দিয়ে বনের বুক থেকে মোরাম ফেলা ফরেস্ট রোড এসেছে, সামনে ওই বাঁশ দিয়ে আটকানো ফরেস্ট নাকা। এ পাশে কিছু আদিবাসী বসতি। সামান্য ধান মকাই বাজরার ক্ষেত। কিছু ঘর বাড়িও রয়েছে।

মেজর গাঙ্গুলির কাজের লোক চাই দু' জন। একজন বাংলো সাফ রাখবে, কাঠ কাটবে, জল তুলবে পাম্প চালিয়ে; আর একজন চাই রসুই-খানায়।

ফরেস্ট অফিসার হরলাল তেওয়ারী সকালেই বনের মধ্যে কাটাই হচ্ছে সেখানে চলে গেছে। কর্তব্যনিষ্ঠ তরুণ অফিসার, তার কানে খবরটা এসেছে যে ওই বন কাটাই-এর ফাঁকে ফাঁকে কিছু বে-আইনি কাটাইও হচ্ছে।

তাই সকালেই বের হয়ে গেছে হরলাল সেই সাইটে খোঁজ খবর নিতে। যে ভাবেই হোক এই চোরা চালান বন্ধ করতেই হবে, যারা এভাবে দামী গাছ কেটে বনভূমিকে শেষ করছে তারা দেশের শত্রু।

হরলাল তেওয়ারী কোনমতেই তা হতে দেবে না।

মেজর গাঙ্গুলির রান্নার লোক যোগাড় করার থেকেও এই কাজ তার কাছে বেশী জরুরী। সুতরাং মেজর গাঙ্গুলি অফিসে গিয়েও তার দর্শন পায় না।

তাতেই মেজাজটা চড়ে ওঠে মেজরের।

বের হয়ে ঘুরছে এদিক ওদিকে লোকের সন্ধানে। কিন্তু লোকের দেখা মিললেও কাজের লোকের দেখা মেলে না।

হতাশ হয়ে ফেরে, ওবেলায় আবার আসতে হবে বিট অফিসারের সন্ধানে।

তেতে পুড়ে এসেছে মেজর।

বাংলোয় তখন ছত্রভঙ্গ অবস্থা। মিসেস গাঙ্গুলি কোনমতে খিচুড়ি নামিয়েছে তেতে পুড়ে।

—এককাপ চা হবে ? মেজর ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে বলে।

ফরমাইস করতে মিসেস গাঙ্গুলিও ফুঁসে ওঠে।

—না। কাঠ জেবলে চা করতে পারবো না। লোকজন দ্যাখো। সর্বেশকেও বলেছি। নাহলে কালই ফিরে চল এখান থেকে। বনবাসে এসে উপোস দিতে পারবো না।

মেজর গাঙ্গুলি স্ত্রীর তাপমাত্রা তরতরিয়ে উঠতে দেখে চাইল ওর দিকে।

আইভিও ক্লান্ত।

জল তুলে আগুন ধরাতেই হিমসিম খেয়ে গেছে। তবু বলে সে।

দেখছি বাবা, উনুনের আংরা এখনও কিছু আছে, যদি চা করা যায়।

আইভি নিজেই চলে গেল কিচেনের দিকে।

মিসেস গাঙ্গুলি বলে—জলদি কর। আবার নীচের ওই ঝোরায় আদিবাসীদের মত গা খুলে নাইতে যেতে হবে। উঃ, কি সুখেই না আছি। মেয়েগুলো জল টেনে হাঁপাচ্ছে—রাজ্যের কাচাকাচি, রান্না, বাসনমাজা, ঝাঁট দেওয়া, কি বাকী আর রইল ? ঢের হয়েছে বেড়ানোতে, তোমাদের মুরোদ বোঝা গেছে, ফিরে চল এবার।

আইভি ততক্ষণে আধ ঠাণ্ডা চা এনেছে। তাইতে চুমুক দিচ্ছে মেজর বোদা মুখ করে।

সত্যিই একেবারে আদিবাসী জীবনেই যেন ফিরে গেছে তারা। মেজর, সর্বেশকেও ওই ঝোরার জলে স্নান করতে হয়েছে স্ত্রী-মেয়েদের মত।

আর খেতে হয়েছে ওই পিণ্ডি পাকানো খিচুড়ি। মেজরের এসব খাওয়া অভ্যাস নাই, আর মিসেস গাঙ্গুলিরও রান্নার অভ্যাস নাই। ফলে যা হয়েছে তা অখাদ্য। প্লেটটা অন্য সময় হলে ছুঁড়েই ফেলে দিত মেজর গাঙ্গুলি। কিন্তু আজ তা করলে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। তাই চুপ করে কিছুটা খাবার চেষ্টা করে উঠে পড়লো।

ওদের আনন্দভ্রমণ যে এমনি এক দুঃখভ্রমণে পরিণত হবে তা ভাবেনি।

ট্রাকটা আসছে বন-পাহাড় পার হয়ে।

ট্রাকের সওয়ারী বলতে আমাদের সেই দুই তরুণ অধ্যাপক রঞ্জন

চ্যাটার্জি আর অঞ্জন ব্যানার্জি। অবশ্য এখন আর ওদের চেনার কোন উপায় নেই।

কলকাতার সেই পোষাকী ভদ্রতার লেশমাত্র আর নেই তাদের চেহারায়।

মাঝে মাঝে কাদায় জলে ট্রাক আটকাচ্ছে আর ড্রাইভারের অশ্রাব্য খিস্তির ভয়ে দুজনেই ক্লিনারের সঙ্গে গাড়ি ঠেলেছে। জলে লাল কাদায় সর্বাঙ্গ রঞ্জিত। জামা-কাপড়ের চেহারাও ধূলি ধূসর। ঘামে-ধূলোতে কাদায়, ক্লান্তিতে তাদের দুই মূর্তিকে আর চেনার উপায় নেই।

অঞ্জন বলে—নেমে পড় রঞ্জন। আর গিয়ে কাজ নেই বাংলোয়।

রঞ্জন বলে—এই বনে এতটা পথ হেঁটে বেরুনো অসম্ভব।

ফেরার পথ আর নেই রে। চল সামনে, যা থাকে বরাতে।

অঞ্জন বলে—বরাত যে মন্দ তা তো বুঝছি। কি আছে অদৃষ্টে কে জানে। সব প্রায় চুরি হয়ে গেল, এখন জানটা না যায়।

ট্রাক চলেছে গভীর বনের বুক চিরে। বনের মধ্যে হঠাৎ দেখা যায় একটা ঝোরার ধারে পাতার কুঁড়ে—কিছু লোকজন রয়েছে।

একটা জিপও রয়েছে বনের মধ্যে।

ট্রাকটা জিপটাকে দেখে থেমে গেলে। একজন স্বাস্থ্যবান যুবক পরনে প্যাণ্ট, চামড়ার দামী জ্যাকেট। সে এগিয়ে এসে ড্রাইভারকে বলে—সব ঠিক আছে তো সিংজী?

সিংজী গলা নামিয়ে বলে—জী সাব্। লালাজী বোলা আউর কুছ লগ—কুছ হাতিকা দাঁত ভেজনে হোগা, আচ্ছা কিম্মৎ দেগা।

ট্রাকের উঁচু ডালার আড়াল থেকে ওদের কথাবার্তাগুলো শুনছে এরা দুজনে। অঞ্জন কি বলতে যাবে, রঞ্জন ব্যাপারটা বুঝে ওকে ইশারায় চুপ করতে বলে।

দেখছে ওরা সিংজী সেদিনের কাঠ বিক্রির টাকার বাণ্ডিলগুলো দেয়। তার থেকে কমিশনও পেয়ে যায় সিংজী নগদ।

লোকটা বলে—কাল ভেট হোগা। ইধার।

জিপটা চলে যায় অন্যদিকে। ট্রাকটাও চলেছে ফরেস্ট অফিসের দিকে।

রঞ্জন বলে—কিছু বুঝলি?

অঞ্জন একটু সাধাসিধে ধরনের ছেলে, কূটবুদ্ধির ধার তার নেই। সাতে পাঁচেও থাকে না। ঈষৎ আপনভোলা ধরনের ছেলে।

সে ওই জিপের ভদ্রলোক আর তাদের ট্রাক ড্রাইভারের কথাবার্তা তেমন মন দিয়ে শোনেনি, শোনার দরকারও বোধ করেনি, তবে টাকার লেনদেনটা দেখেছিল। তাতে যে সন্দেহের কিছু থাকতে পারে সেটা ভাবেনি। এবার রঞ্জনের কথায় বলে।

—বোঝার কি আছে ?

হাসে রঞ্জন। বলে সে।

—অনেক কিছুই আছে। ওই লোকটা মোটেই সুবিধের নয়। জঙ্গলের দামী কাঠ চুরি করে পাচার তো করেই তাছাড়া জঙ্গলের জন্তু-জানোয়ারও মেরে তাদের দামী চামড়া মায় হাতির দাঁত অবধি পাচার করে।

এক-একটা বাঘের চামড়ার দাম বাইরে লাখ খানেক টাকা আর হাতির দাঁত-এর দামও আকাশছোঁয়া। পাঁচ হাজার টাকা কেজি। চিতাবাঘের চামড়াও বিশ পঁচিশ হাজার হতে পারে।

অঞ্জন এসব জানতো না। অবাক হয় সে।

রঞ্জন বলে—এরা বনের কাঠ বেচে লাখ লাখ টাকা পায়। আর চোরা কাটাই-এর ফলে বনকে বন সাফ হয়ে বন্ধ্যা জমিতে পরিণত হয়। বৃষ্টিপাত কমে যায়, আর বৃষ্টি হলে ভূমিক্ষয় হয়ে সব পাথুরে টিলায় পরিণত হয়। দ্যাখনা ওদিকের পাহাড়টা—স্রেফ পাথরগুলোই খাড়া হয়ে আছে। ঊষর-রুক্ষ পাহাড়।

দেখছে অঞ্জন নিরাভরণ রিক্ত পাথরের একটা হাড় পাঁজরা বের করা স্তূপকে। রঞ্জন বলে।

—এটা এমন ছিল না। ওর বুকেও ছিল সবুজ গাছের সারি, মাটির পেলব ছোঁয়া, ওই শয়তানের দলই চোরা কাটাই করে ওর সব সবুজ স্বপ্নকে শেষ করে দিয়েছে।

ওরা বনের শত্রুই নয়, দেশেরও শত্রু। লুণ্ঠনকারী ডাকাত।

অঞ্জন শুনছে ওর কথাগুলো।

ট্রাকটা এবার বনের গভীর ছায়া অন্ধকার থেকে বের হয়ে কিছুটা ফাঁকাতে এসেছে। জঙ্গল এখানে নেই। একটা ছোট্ট উপত্যকা। চারিদিকে বনমুক্ত ঢালু জমিতে ধান, মকাই-এর ক্ষেত। সরষের সাদা ফুল ফুটেছে।

দূরে দেখা যায় কিছু আদিবাসী বসত, ছেলেদের চীৎকার, কুকুরের

ডাক, কাকের কলরব শোনা যায়। জঙ্গলে এদের কোন অস্তিত্বই থাকে না। এসব মানুষের বসতি। ছাগল গরু দু'চারটে মাঠে চরছে।

খালি ট্রাকটা এসে ফরেস্ট নাকার সামনে থামলো।

ড্রাইভার এবার মুখ বাড়িয়ে ট্রাকের দুই মূর্তির উদ্দেশ্যে বলে।

—উতরো এ্যাই লৌন্ডা, তেরে থলাকাবাদ আ গিয়া। উতরো।

থলাকাবাদ এসে গেছে খবরটা শুনে ট্রাক থেকে অঞ্জন রঞ্জন কোম্পানী নামলো, একেবারে উস্কো খুস্কো ধুলি ধূসর চেহারা। জামা প্যাণ্ট কবে যে কাচা হয়েছিল, ইস্ত্রী করা হয়েছিল তা বোঝার উপায় নেই।

দুজনের সম্বল দুটো সাইড ব্যাগ।

প্যাণ্ট পা অবধি গোটানো—কোমরে গামছাটা জম্পেশ করে বাঁধা।

ট্রাকের ছোট্ট আয়নায় নিজেদের দেখে চিনতে পারে না। রঞ্জন বলে।

—আয় বাপ, এ যে চঙ্গু আর মঙ্গু হয়ে গেছি রে।

কে বলবে কলকাতার মাল।

অঞ্জন একটু নিরীহ ধরণের। সে বলে।

—এখন বাংলোর চৌকিদার যদি হাঁকিয়ে দেয় এই চেহারা দেখে—ঢুকতে না দেয়?

রঞ্জন বলে—তাও অসম্ভব নয়।

চমকে ওঠে অঞ্জন। চারিদিকে গহণ বন। বলে সে।

—থাকবো কোথায়? এদিকে ফেরারও পথ নাই, পকেটও গড়ের মাঠ। তোর পাল্লায় পড়ে এখন কি হবে কে জানে!

হাসে রঞ্জন—ঘাবড়াও মৎ দোস্ত। বিহেভ লাইক রোমানস্ হোয়েন ইউ আর ইন রোম। যখন যেমন তখন তেমন। চলতো—ব্যবস্থা যা হোক একটা হবেই।

দুজনে এগিয়ে চলেছে পথ ধরে, সামনে একটু দূরে দেখা যায় ওপাশে টিলার উপরে বাংলোটাকে।

অঞ্জন বলে—ওইটাই সেই ফরেস্ট বাংলো। কিন্তু এদিকে টাকা পয়সারও টানাটানি, এমন সুন্দর জায়গাটায় দু'চার দিন যে শান্তিতে থাকবো তার উপায় নাই।

রঞ্জন ও ভাবছে কথাটা। বলে সে।

—তা সত্যিরে। এখানে এসে আর ফিরে যেতে ইচ্ছা করছে না। দারুণ জায়গা—

দুজনে এগিয়ে আসছে, হঠাৎ কার গুরু গম্ভীর গলার ডাক শুনে চাইল রঞ্জন।

এক শুট পরা বয়স্ক ভদ্রলোক মুখে একজোড়া বিড়ালের ন্যাজের মত পুরুষ্ট গোঁফ নিয়ে বলে।

—কোত্থেকে, এখানে কেন? কাজ কর্ম করার ধান্দায় না অন্য কোন মতলবে এসেছো?

রঞ্জন দেখছে ভদ্রলোককে।

বলে রঞ্জন—না, কাজকর্ম করার জন্যই এসেছি।

—কি কাজ করতে পারবে? ভরাটি গলায় মেজর গাঙ্গুলি এবার প্রশ্ন করে। তার কাজ করার লোকের দরকার। এখানে তেমন কাউকেই পায় নি। বিট অফিসারও তেমন কাজ জানা লোকের সন্ধান দিতে পারে নি, কাঠ কাটা—বাঁশবন কাটার লোকের ব্যবস্থা সে করতে পারে, বাংলোর কাজ জানা লোক এখানে বিরল।

'হতাশ হয়ে ফিরছিল গাঙ্গুলি সাহেব, পথে ওই দুই মূর্তিকে দেখে পথ আগলে জেরা শুরু করে। চেহারা, পোষাক আশাক দেখে মনে হয় ওরা গরীবই আর কাজের সন্ধানেই ঘুরছে।

কাজের লোকের খুবই দরকার আজ মেজর গাঙ্গুলির, নাহলে এখান থেকে বিদায় নিতে হবে। তাই ওদের দুজনকে দেখে এবার কাজের কথাই পাড়ে।

রঞ্জন দেখছে ওই বিচিত্র দর্শন কোলাব্যাঙ-এর মত শহুরে জীবটিকে। মেজর গাঙ্গুলি বলে।

—ওই বাংলোতে ক'জনের রান্না করতে হবে, আর অন্যজন টুক টাক কাজ করবে। ওই বাংলোতে যে ক'দিন আছি আমরা ততদিন। তারপর তোমাদের কাজ ভালো লাগলে সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে যাবো। তাতে রাজী না হও যেও না। এখানে দশদিন কাজ করবে, বাংলোতেই থাকবে খাবে, থাকা খাওয়া ফ্রি, ডেইলি টোয়েন্টি রুপিস—

অঞ্জন ওদের হঠাৎ ধরে এমনি চাকরীর প্রস্তাব দিতে চমকে ওঠে। তাদের যে চাকর বাকর ক্লাসেরই ভাববে ওই ভদ্রলোক তা ভাবতেও পারে নি।

সে থতমত খেয়ে যায়, মানে ইয়ে—

রঞ্জন ব্যাপারটা বুঝেছে আগেই, সে সবকিছুই সহজ ভাবে নিতে পারে। এমনিতে সে ভালো স্পোর্টস্‌ম্যান, তাই ক'দিন এই গহনবনরাজ্যে এই ধরনের চাকরীর খেলাটাও তার খেলতে ইচ্ছা হয়।

তাদের তো কেউই চেনে না এখানে।

টাকাপত্রও প্রায় সব শেষ। কলকাতায় ফিরতে গেলে তাদের এখান থেকে বের হয়ে, বড়বিলের শহরে কাকার কাছে যেতেই হবে, টিকিটের পয়সাও নাই।

আর রঞ্জন তার ওই বুনো কাকাবাবুকে ভালো করেই চেনে। তাদের এই অসাবধানতার জন্য বকুনি তো খেতেই হবে উল্‌টে সাতরকম কৈফিয়ৎ, গোঁফনাড়া (কাকাবাবুরও বৃহৎ একজোড়া গোঁফ আছে) এসব সইতে হবে।

তাই হঠাৎ যেচে এমন লোভনীয় চাকরীর অফার আসতে মজাই পায়। রঞ্জন হিসাব করে নেয় দশদিন ফ্রি থাকা খাওয়া যাবে বাংলোয়, আর দশ দিনে দু'শো করে চারশো টাকা নগদ।

তাদের শান্তিতে ঘরে ফেরার ভাড়াও উঠে যাবে। রঞ্জন তাই অঞ্জনকে আপাততঃ চুপ করে থাকার জন্য ইশারা করে।

অঞ্জন তবু বলে—মানে—

মেজর গাঙ্গুলি এবার বলে—ইংরাজী বোঝো না? কুড়ি টাকা করে পাবে এক একজন দৈনিক।

রঞ্জন একেবারে পেশাদার পাকা চাকরের মত মাথা চুলকিয়ে বিনীত ভাবে বলে।

—আজ্ঞে কম হয়ে যাচ্ছে।

মেজর গাঙ্গুলি এবার আশার আলো দেখে প্রদীপ্ত কণ্ঠে বলে—ও কে। পঁচিশ টাকা করেই দেব পার হেড। তা কাজকর্ম পারবে তো? এমন কিছু নয়। রান্না বান্না—ডাল, ভাত, চাপাটি, সব্জী—মাংস—ডিম, আর একজন পাম্প করে জল তুলবে—বাংলোর ঘর দোর সাফ করবে। চা বানাবে টুক টাক কাজ—

অঞ্জন কি যেন বলতে চায়। বাড়িতে তবু রঞ্জন কিছু কাজকর্ম করে, কিন্তু তার এসব অভ্যাস নাই। তাছাড়া এসব কাজ কেন করতে যাবে?

কিন্তু রঞ্জন বলে ওঠে অঞ্জনকে থামিয়ে দিয়ে।

—হ্যাঁ স্যার। আমি জামসেদপুর রোজ হোটেলে কাজ করতাম স্যার। রান্না বাড়া—সব্জী, রেশমী কাবাব, কষামাংস—চিলি চিকেন—ওমলেট সব বানাতে পারি স্যার। আর আমার এই খুড়তুতো ভাই ও বেয়ারার কাজ করতো। হোটেলটা উঠে যেতে বেকার হয়ে ঘুরছি স্যার।

মেজর গাঙ্গুলি বলেন—ঠিক আছে, চলো মন দিয়ে কাজ করবে। কাজ পছন্দ হলে তোমাদের দুজনকেই কলকাতায় নিয়ে যাবো ওখানেও কাজ করবে।

রঞ্জন খুশিভরে বলে—তাহলে তো খুব ভালো হয় স্যার।

মেজর গাঙ্গুলি শুধোন—হ্যাঁ, তোমাদের নাম তো জানা হ'ল না। রঞ্জন বেশ সপ্রতিভ ভাবে বলে।

—আজ্ঞে আমার নাম চন্দ্রমোহন সরখেল আর ও মদনমোহন সরখেল।

মেজর গাঙ্গুলি বিড় বিড় করে।

—এ্যাঁ, চাকরের নাম চন্দ্রমোহন—মদনমোহন—

রঞ্জন বলে ওঠে—আজ্ঞে ভালবেসে সবাই আমাদের চঙ্গু মঙ্গু বলেই ডাকে। আপনিও তাই ডাকবেন।

হাসছে মেজর—কারেক্ট। চঙ্গু এ্যাণ্ড মঙ্গু! ভেরিগুড। চলো।

পথ থেকে একটা জিপ যাবার পথ বের হয়ে ঝোরার উপর মোটা কাঠের পাটাতন দিয়ে তৈরী ব্রিজের উপর দিয়ে টিলার গায়ে পাক খেয়ে উপরে উঠে গেছে বাংলোর সামনে।

পাহাড়ী চড়াই-এর পথের দুদিকে কাঠ চাঁপা, কলকে রঙীন বোগেনভিলা ফুলের রংবাহার ফুটে ওঠে।

রঞ্জনরা চলেছে ওই মোটকা ভদ্রলোকের পিছু পিছু, চড়াই ভেঙ্গে উঠে এল ওরা বাংলোর সামনের সুন্দর বাগানে। ফুলের টব দিয়ে সাজানো, তাছাড়া বেশ কিছু ছোট বড় নানা ধরণের গাছও রয়েছে। সামনে বাঁধানো চাতাল।

সেখানে বসে আছে ক্লান্ত মিসেস গাঙ্গুলি, আইভি আর বেবী।

ওরা খাওয়া দাওয়ার পর নিজেরাই বাসন কোসন মেজে একটু জিরোচ্ছে। বৈকালে আবার কাঠ জেলে চা করতে হবে, রাতের খাবার—কথাগুলো ভাবতেও কষ্ট হয়।

সর্বেশ দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর কি জরুরী কাজে জিপ নিয়ে বের হয়েছে বনের বাইরে এদিকে কোন আধাশহরে যাবে খাবার, টিনড্

ফুড, বিস্কুট, ডিম, কেক, ফল, সব্জী সর্বোপরি মদের যোগান ফুরিয়ে গেছে, মদ আনতে হবে।

তার ফিরতেও দেরী হবে।

মেজর গাঙ্গুলিকে আসতে দেখে চাইল মিসেস গাঙ্গুলি। শুধোয়। কি হলো? কাউকে পেলে?

মেজর গাঙ্গুলি এবার গোঁফ চুমরে বলে।

—পাবো না মানে? মেজর রিপুদমন গাঙ্গুলি কখনও জীবনের যুদ্ধে হার মানেনি ম্যাডাম, পাবো না? অলরেডি পেয়ে গেছি, আর একজন নয়, দুজনকে।

হ্যাঁ কি যেন নাম—ইয়েস চঙ্গু এ্যাণ্ড মঙ্গু'।

মিসেস গাঙ্গুলি অবাক হয়—চঙ্গু মঙ্গু কি বলছো?

এর মধ্যে ওই দুই ধুলি ধুসর মূর্তি এসে গেছে। মেজর গাঙ্গুলি এবার রঞ্জনকে দেখিয়ে বলে দিস ইজ চঙ্গু।

আর অঞ্জনকে দেখিয়ে বলে—হিয়ার ইজ মঙ্গু। সব কাজ-কম্ম জানে এরা। আগে হোটেলের কুক ছিল। বেয়ারাগিরিও করেছে। ব্যস—এবার আমি নিশ্চিন্ত। ওদের সব কাজকর্ম বুঝিয়ে দাও।

আইভি, বেবী দেখছে ওই দুজনকে।

ধুলো কাদা মাখা পোশাক, ঝড়োকাকের মত চেহারা হয়ে আছে বেচারাদের। দিনভোর খাওয়াও জোটেনি।

মিসেস গাঙ্গুলি ওদের দেখে শুধোয়।

—কাজকর্ম সব পারবে তো?

অঞ্জন নীরব রাগে ফুঁসছে, রঞ্জন যে সত্যি চাকর বেয়ারা গিরিতে হাত দেবে তা ভাবতেও পারছে না। রঞ্জন বোবা অঞ্জন এটাকে পছন্দ করছে না। তাই রঞ্জন বলে।

—হ্যাঁ মা—

মিসেস গাঙ্গুলি সঙ্গে সঙ্গে শুধরে দেয়—মেমসাহেব।

রঞ্জনও খেই ধরে বলে—হ্যাঁ, মেমসাহেব। সব কাজই পারবো।

মেজর গাঙ্গুলি শোনায়—হ্যাঁ, পারবে বই কি। আমি সিলেক্ট করেছি। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না কেউ। আমি বলছি ওরা ভেরি গুড বয়। ভেরি হেল্পফুল। যা যা বানাবে।

মিসেস গাঙ্গুলি বলে—আগে ওদের সাবান মেখে ঝোরার জলে গিয়ে

সাফ সুতরো হয়ে আসতে বল। তারপর—

আইভি বলে— দিনভোর বোধ হয় খায়নি ওরা মা।

রঞ্জন খাবার কথা শুনে চাইল মেয়েটির দিকে। আইভি বলে মাকে।
—ওদের কিছু খেতে দাও, তারপর কাজের কথা হবে।

মেজর গাঙ্গুলি বলে — আইভি ঠিকই বলেছে। সাবান দাও, স্নান করে আসুক। কাল সর্বেশকে বলো শহর থেকে ওদের জন্য পোশাক পত্রও কিনে আনুক। বুঝলে বেয়ারা, কুক মাস্ট বি ওয়েল ড্রেসড। কাল দেখা যাবে। আইভি ওদের থাকার জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে আয়।

বাংলোটা বেশ বড়ই, সামনেটা সাজানো।

পিছনেও পাহাড়ের খানিকটা কেটে সমতল মত করা, দু'চারটে প্রাচীন মহুয়া, বহড়া—শাল গাছ রয়ে গেছে। ওর ওদিকে খাপরার চালার লম্বা কয়েকটা ঘর। তার পিছনে শুরু হয়েছে অরণ্য। তার একটায় কিচেন, অন্যদিকে একটা ঘরে তাদের থাকার ব্যবস্থা। মালি, চৌকিদারদেরই ঘর। দুটো বাবুই দড়ির চারপাই, আর ওদিকে কয়েকটা তক্তা জুড়ে লম্বা টেবিলমত করা।

চারপাই-এ ময়লা চিটকে তোষক আর তেলচিটে বালিশ পড়ে আছে, চাদর একটা আছে নাম মাত্র।

এই ওদের বাংলোর ঘর। অথচ তাদের ব্যাগে বাংলোর ওই সুন্দর ঘর—ভালো বিছানায় থাকার অনুমতি পত্র রয়েছে। আইভি এসে ওদের ঘর দেখিয়ে বলে।

—এটা থাকার ঘর, কিচেন ওদিকে। বাসনপত্রও সব সেখানেই আছে। আর ওইখানে পাম্প রয়েছে। হাতে পাম্প করলে নীচের রিজার্ভার থেকে ট্যাঙ্কে জল উঠবে, নাহলে বালতি নিয়ে নীচের ঝোরা থেকে জল টানতে হবে। যাও স্নান করে এসো।

আইভি চলে যেতে অঞ্জন এবার দরজাটা বন্ধ করে বলে।

—এসবের মানে কি?

রঞ্জন এর মধ্যে ব্যাগটা রেখে ওই চারপাই-এ টানটান হয়ে শুয়ে পড়েছে। অঞ্জন রাগে ফেটে পড়ে।

—কুক, বেয়ারা! চঙ্গু মঙ্গু। কি হচ্ছে এসব? এই করতে এসেছি এখানে?

ওর কথায় রঞ্জন বলে।

—চুপ। একদম চুপ। এভাবে নাহলে বাংলোতে ঢুকতে দিত না বেয়ারা, পকেটে পয়সাও নাই ফেরৎ যাবার। এ তবু ঠাঁই জুটলো—খাওয়া দাওয়াও জুটবে।

—চাকর বেয়ারাগিরি করতে হবে ?

—আহা! নতুন ব্যাপারটা একটু দ্যাখনা। চলে যেতে একমিনিট ও লাগবে না। হেরে যাবি লড়াই-এ? নেভার, এখানে থাকবো—কাজের ফাঁকে আমাদের কাজও চলবে ঠিক মতই।

লড়ে যাও দোস্ত—টেক ইট ইজি।

রঞ্জন সান্ত্বনা দেয় বন্ধুকে।

এই জীবনটার সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল না তাদের।

স্নান টান করে এসে হাড়ির তলানি খিচুড়ি কিছুটা যা ছিল তাই দিয়েই দিনের খাওয়া সারছে তারা।

মিসেস গাঙ্গুলি এর মধ্যেই তাদের কাজের ফর্দও শুনিয়েছে। আর যে সব ফর্দ সে পেশ করে তাতে অঞ্জনের গলাতে খিঁচুড়ি আটকাবার উপক্রম হয়ে যায়।

একজন রান্না নিয়ে—খাবার সার্ভ করা নিয়ে থাকবে। অঞ্জনকে বাংলোর কাজকর্ম কাচা কুচি সাফ মায় জুতো সাফ অবধি করতে হবে।

বৈকালে চা'বটায় চা দিতে হবে।

রঞ্জন সবটাতেই সায় দেয়। মিসেস গাঙ্গুলি ফর্দ পেশ করে বলে।

—তাহলে সেইমত কাজ সব বুঝে নাও।

খাবার পর ওরা দুজনে তাদের সেই খাপরার চালার ঘরে এসে চারপাই-এ আশ্রয় নেয়। কাল রাত ভোর ট্রেনের ধকল গেছে, সকালে স্টেশনে নেমে ট্রাক ঠেলে ঠেলে এসেছে এই বনে, গা গতর টাটিয়ে গেছে—তাই শোবার সঙ্গে সঙ্গেই দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ে ক্লান্তিতে।

বাংলোর মেজর গাঙ্গুলি এখন নিশ্চিন্ত।

মিসেস গাঙ্গুলিও কাজের লোক দুজনকে পেয়ে খুশি হয়েছে।

সর্বেশ ফিরছে তার কাজকর্ম-এর ব্যবস্থা করে। তার মন মেজাজও খুশি, এখানে তার চোরা চালানের কাজ ভালোই চলেছে।

বিরাট বনরাজ্য, এখানের শাল এশিয়ার মধ্যে সেরা। শিলিগুড়ির

শাল কাঠের কদর আছে, বাজারে ওটাই বেশী মেলে, কিন্তু সারান্দার শাল গাছ গুলো বিশাল। আট দশ ফিট তাদের গুঁড়ির ব্যস, যার দাম বাজারে অনেক। এছাড়া আছে দামী রোজউড গাছ এখানে। যেমন সোনালী রং সেই কাঠের তেমনি ফিনিস করা যায়। তার দামও অনেক, বাজারে পড়তে পায় না। সৌখিন আসবাব তৈরীতে এর জুড়ি নাই। সেসব কাঠও গভীর বন থেকে নানা কৌশলে পাচার করছে সর্বেশের চোরা কাটাই বাহিনী।

আর তীর দিয়ে না হয় বিষ দিয়ে মেরে হায়না, চিতার চামড়া হাতি মেরে তার দাঁত পাচারের কাজও চলছে পুরো দমে। আমদানিও ভালোই হচ্ছে সর্বেশের।

ওসব কাজ-এর তদারক করে শহর থেকে মার্কেটিং করে ফিরছে। মেজর গাঙ্গুলি তখন বিকটস্বরে নাক ডাকিয়ে দিবানিদ্রায় ব্যস্ত।

মিসেস গাঙ্গুলি বলে—হাতমুখ ধুয়ে নাও সর্বেশ, আইভি, সর্বেশের খাবারটা ওর ঘরে দিয়ে আয়।

সর্বেশ বলে—শহর থেকে লাঞ্চ করে এসেছি। আইভি, বরং এক গ্লাস জল পাঠাতে পারো তো দ্যাখো। ওই নতুন বেয়ারাকে বলো।

ক্লান্ত দুপুর।

চারিদিক সুন সান। ওই দুপুরে রোদের উষ্ণতা সারা বনভূমি যেন গায়ে মেখে তার কবোষ্ণ উত্তাপকে অনুভব করছে।

আইভি ওই আউটহাউসের চালায় বেয়ারার সন্ধানে এসে দেখে দুজনেই অঘোরে ঘুমুচ্ছে। বেচারারা! আইভি আর ওদের ডাকে না।

নিজেই ওদিকের কিচেন থেকে গ্লাসে জল নিয়ে সর্বেশের ঘরে যায়।

—তুমি? বেয়ারা কোথায়? সর্বেশ শুধোয়।

আইভি বলে—ওরা এতটা পথ এসে একটু রেষ্ট নিচ্ছে—তাই ডাকিনি। নিজেই নিয়ে এলাম।

সর্বেশ দেখছে আইভিকে।

আবছা আলোয় ওর নরম মুখে কমনীয়তা ফুটে ওঠে। চোখের চাহনিতে কি স্নিগ্ধতা। সর্বেশ বলে।

—বেচারা বেয়ারাদের জন্যও তোমার কত দরদ, কিন্তু এই বেচারার কথা এতটুকুও ভাবো না। তোমার জন্যই এখানে এসেছি, দুটো দিন একান্তে কাছে পাবো বলে, কিন্তু তোমারই দেখা নেই।

আইভি জানে ওই লোকটার মনোভাব। আইভি'র ভালো লাগে না

এই সব।

তবু বলে আইভি—আপনারই সময় নেই। সর্বদাই কাজে ব্যস্ত। এখানে এসেও এত কি কাজ আপনার যে বনে বনে ঘোরেন।

সর্বেশ জানতে পারে না তার আসল কাজ-এর ব্যাপারটা। তবু বলে সে।

—ঠিক আছে, এবার সময় করে তোমাকে এই বনের বেশ কিছু সুন্দর জায়গা দেখিয়ে আনবো। খুব ভালো লাগবে তোমার।

—দেখা যাক।

আইভি বের হয়ে আসে কথাটা বলে।

সর্বেশ বলে—একটু বোসো।

আইভি এড়াতে চায় ওই লোকটিকে। ওর চোখ মুখে শুধু লালসার ছাপই ফুটে ওঠে সেটা আইভি'র চোখে ধরা পড়ে সহজেই।

আইভি বলে—যাই, চা-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

বাবা বোধহয় উঠে পড়েছেন।

নাসিকাধ্বনি থেমে গেছে। মেজর সাহেবের দিবানিদ্রা শেষ হয়েছে। এবার চায়ের দরকার।

মেজর সাহেব-এর সবই ঘড়িধরা ব্যাপার, মিলিটারীর অভ্যাসগুলো ছাড়তে পারেনি চাকরী ছাড়তে বাধ্য হলেই।

হাঁক পাড়ে—চা।

তাতেও কারো সাড়া না পেয়ে বড় সাহেব এবার গলাতুলে ভরাটি স্বরে হাঁকে—চঙ্গু, মঙ্গু! চা বোলাও।

এ্যাই চঙ্গু, মঙ্গু! জলদি—

ওদিকে রঞ্জনের ঘুম ভেঙ্গে গেছে। অঞ্জনও উঠে পড়েছে। চারপাই নয় ছারপোকার আড়ৎ। তখন বোঝা যায় নি, শোবার কিছুক্ষণ পরই কিলবিল করে ছারপোকাকুল বের হয়ে যুগপৎ আক্রমণ চালিয়েছে।

লাফ দিয়ে ওঠে অঞ্জন—ওরে বাব্বাঃ। এ্যাই রঞ্জু দ্যাখ কি কাণ্ড!

কাণ্ডটার খবর রঞ্জনও পেয়েছে। সর্বাঙ্গে কামড়াচ্ছে ছারপোকার দল। রঞ্জন বলে—কাল এর বাবস্থা হবে। আজ কোনমতে পার কর।

অঞ্জন বলে—কাল অবধি টিকবো তো? এরপর শুরু হবে কাজ—একেবারে বেয়ারাগিরি।

এইসময় ডাকটা ধ্বনিত হয়—চঙ্গু, মঙ্গু—আরে, গিয়া কাঁহা—

—চঙ্গু! ডাকটা চড়ছে উচ্চগ্রামে।

হঠাৎ খেয়াল হয় রঞ্জনের।

—আরে চঙ্গু, মঙ্গু তো বর্তমানে আমাদেরই নাম! ভুলে গেলি? অঞ্জন বলে—যা পাল্লায় পড়েছি এবার বাপের নামই না ভুলিয়ে দেয়।

রঞ্জনরা ওঠার আগেই মেজর সাহেব এগিয়ে আসে।

—চঙ্গু, মঙ্গু!

ওরা দুজনে বের হয়—জী সাব।

মেজর গর্জন করে—চার বাজে 'টি' দেনা। চার বাজ গিয়া।

যাও। চা লাও।

আর মঙ্গু তুম ঝাড়ু লাগাও, বিলকুল রুম বারান্দা সব সাফা করো। কুইক।

চঙ্গু অথাৎ অঞ্জন এবার কোমরে গামছা বেঁধে ঘরে ঝাড়ু দিতে থাকে। রাগে গা জ্বালা করছে। এই ঝাড়ুদারের ভূমিকায় কলকাতার চেনা কেউ দেখলে কি সর্বনাশ হবে তা ভাবতেও পারে না।

মুখবুজে ঝাড়ু দিচ্ছে।

মিসেস গাঙ্গুলি বলে—ঠিক সে ঝাড়ু লাগাও। ঝাঁট দিতেও শেখনি?

আঁইভি দেখছে ওদের।

বেবী বলে—বাবা, তোমার রিক্রুট করা লোকরা কাজ ঠিকমত করতে জানে না?

মেজর গাঙ্গুলি বলেন—হোটেলের বেয়ারা, ঝাঁটা চালাতে জানবে কি করে? ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চালায়, না হে?

অঞ্জন বোদা মুখ করে বলে—হ্যাঁ সাব।

মেজর গাঙ্গুলি বলে—দু'একদিনের মধ্যে এসব শিখে নেবে। কাজ শিখলে নোকরী পাকা হয়ে যাবে। মন দিয়ে কাজ শেখো।

ঝাড়ুদারগিরিই শিখছে এখানে এসে অধ্যাপক অঞ্জন ব্যানার্জি একমনে।

ওদিকে উনুনে বেশ কিছু কাঠ গুঁজে অগ্নিকাণ্ড বাধাবার চেষ্টা করছে রঞ্জন কিচেনে। আগুন জ্বলে না—স্রেফ ধোঁয়াই ওঠে গলগল করে। ফুঁ দিয়ে চলেছে। নাক চোখ দিয়ে জলই গড়াচ্ছে তবু চায়ের জল গরম হয় না।

ওদিকে চায়ের দেরী দেখে আইভি নিজে আসে কিচেনে—দেখে তখন

কোনমতে আগুন জেবলে চায়ের জল নামিয়েছে রঞ্জন।

আইভি দেখছে চা বানানোর ব্যাপারটা।

বলে সে —এমনি করে কি হোটেলে চা বানাতে ?

চাইল রঞ্জন। অনভ্যস্ত হাতে চা বানানো হচ্ছে এটা বুঝেছে আইভি।

রঞ্জন বলে—না মেমসাব, সেখানে গ্যাসে বানাতাম—

—মেমসাব আমি নই, আমার নাম আইভি।

—জী মেমসাব !

রঞ্জন ওকে যেন মেমসাবই বানাতে চায়।

এর মধ্যে পটে লিকার—চিনি, দুধ আলাদা করে ট্রেটাতে সাজিয়ে দেয় আইভি নিজে বলে।

—এবার নিয়ে চলো।

ওদিকে বারান্দায় টেবিলে বসে আছে মেজর সাহেব চায়ের জন্য। সর্বেশও এসে বসেছে। মিসেস গাঙ্গুলি আবার সেই উলের গোলা—কাঁটা বের করে কি এক কাল্পনিক সোয়েটার বুনতে ব্যস্ত।

ওদিকে অঞ্জন তখন বারান্দায় ঝাঁট সেরে এবার সোফা গুলোকে ঝাড়ছে।

—এতদেরী ? হুম ! গর্জে ওঠে মেজর সাহেব।

লোক পেয়েই তার মেজাজও এখন বদলে গেছে। বলে মেজর।

—টাইম মেনটেন করতে হবে। ডিসিপ্লিন ফাষ্ট—ডিসিপ্লিন মাষ্ট। নাহলে আমি কিন্তু সইব না। কি বল সর্বেশ ?

রঞ্জন চুপ করে শোনে। এবার সর্বেশকে দেখে রঞ্জন একটু অবাক হয়। ওই ব্যক্তিটিকে সে আজ সকালে দেখেছিল বনের গভীরে জিপ নিয়ে। চোরাই চালানকারীদের গ্যাং লিডার সে, আর ওই সাংঘাতিক লোকটাকে এখানে এই বাংলোয় দেখবে তা ভাবেনি।

সর্বেশ বলে।

—এই আপনার নতুন রিক্রুট মেজর সাব ?

মেজর বলে—হ্যাঁ। দিস ইজ চঙ্গু, এ্যাণ্ড দ্যাট ইজ মঙ্গু। কোন হোটেলে কাজ করতো জামসেদপুরে। এখন বেকার।

সর্বেশ দেখছে ওদের দুই মূর্তিকে সন্ধানী দৃষ্টিতে। রঞ্জন মুখ নামিয়ে চা সার্ভ করে। আইভি বলে।

—যাও পরে কাপ প্লেট উঠিয়ে নিয়ে যাবে।

মিসেস গাঙ্গুলি বলে—আর বেলা থাকতে জল তুলে ফ্যালো মঙ্গু। হ্যারিকেন লণ্ঠন রেডি করো। চঙ্গু রাতে রুটি, ডাল—আর চিকেন হবে।

সর্বেশ বলে—ভালো করে বানাবে খানা।

রঞ্জন ঘাড় নাড়ে।

বৈকাল নামছে বনভূমিতে। সূর্য পাহাড়ের ওদিকেই ঢলে পড়লে এখানেই অন্ধকার নামতে থাকে। শান্ত সুন্দর বনভূমির রূপও বদলে যায়।

আজ সর্বেশ বের হয়েছে জিপ নিয়ে—আইভিকে নিয়েই বনে যাবার ইচ্ছা ছিল তার, কিন্তু আইভিই ডাকে।

—এই বেবী চলনা বসে বসে কি করছিস। বনে ঘুরে আসবি। আয়।

সর্বেশ আশা করেছিল একাই পাবে সে আইভিকে একান্তে, কিন্তু তা হয় না। বেবী বলে।

—কি সর্বেশ দা, যেতে পারি? অবশ্য আপনাদের যদি ডিসটার্ব করা না হয়।

সর্বেশ জানে ওই ছোট মেয়েটা বেশী চঞ্চল আর মুখরা। তার তুলনায় আইভি অনেক স্থির, ধীর। দুই বোন যেন একেবারে বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। দুই জনের প্রকৃতিও ঠিক বিপরীত ধরণের।

সর্বেশ ভয় করে ওই দুরন্ত মেয়েকে।

কখন কি করে বসে কে জানে? তাই বলে সর্বেশ বেবীর কথায়।

—না, না, ডিসটার্বড কেন হবো, বরং খুশিই হবো।

—তাই নাকি? তা হঠাৎ এত খুশি হবার কি হলো মশায়?

বেবী কলকলিয়ে ওঠে। সর্বেশ বলে।

—সুন্দরী মেয়েদের পাশে বসে খুশি হবো না?

—তাহলে দিদির পাশেই বসুন। আমি পিছনে বসছি।

বেবী পিছনের সিটে উঠে বসলো।

বের হয়ে যায় ওদের নিয়ে সর্বেশ, নিজেই জিপ চালাচ্ছে।

রঞ্জন রান্নাঘরে তখন বাসন মাজতে ব্যস্ত, জল তুলছে অঞ্জন। রঞ্জন ব্যাপারটা দেখেছে আগে থেকেই। ওই সর্বেশকে দেখে অবধি তার মনে হয়েছিল ওই লোভী মানুষটা সমাজের বুক থেকে সবকিছু সুন্দরকে লুঠ করে নিজের হাতের মুঠোতে আনতে চায়। লোভী মানুষদের এইটাই সহজাত প্রবৃত্তি।

তাই অরণ্যের সব সবুজ গাছপালা, সুন্দর প্রাণীদের হত্যা করে নিজে তার মুনাফা পেতে চায়। এখানেও ওই দুটি সুন্দর মেয়ের মধ্যে শান্ত নম্র সুন্দর ওই আইভি'র দিকে ওই লোকটার লোভী দৃষ্টির সন্ধান পেয়েছে রঞ্জন।

আইভি যে ওই লোকটাকে আদৌ সহ্য করতে পারে না তা বুঝেছে রঞ্জন ওর ব্যবহারে। এড়াবার চেষ্টাও করে, কিন্তু যে কোন কারণেই হোক তা পারে না।

দেখেছে রঞ্জন ওই মোটা মেজর সাহেব মায়, তার স্ত্রী ওই মেমসাহেব অবধি সর্বেশকে সমীহ করে চলে। আজ জিপে আইভি, বেবীকে ওঠার সময় মেমসাহেব বলে।

—বনের সুন্দর সিনারিগুলো দেখে আসবি আইভি।

সর্বেশ সব চেনে।

ওই মোটকা মেজর সাহেবও গোঁফ নাড়িয়ে এক গাল হেসে সর্বেশকে যেন শুভেচ্ছা জানায়।

—বেস্ট অব দি লাক!

অর্থাৎ সর্বেশ যেন এদেরও হাতের মুঠোর মধ্যে এনেছে, আর এঁদের প্রশ্রয় পেয়েই ওই নিরীহ অসহায় সুন্দর মেয়েটার সর্বনাশই করবে।

রঞ্জন বাসন মাজা বন্ধ করে বলে।

—কিছু বুঝলি ব্যাপারটা অঞ্জু? ওই ব্যাটার কাণ্ড—

অঞ্জন তখন পাম্প করছে প্রাণপণে, নীচের ঝোরা থেকে পাইপে জল চলকে চলকে পড়ছে ট্যাঙ্কে। হাঁপাচ্ছে অঞ্জন। ব্যাপারটা দেখছে সে। ওই সর্বেশকে সে আগে বনের মধ্যে চোরা চালানের কাজে দেখেছিল, এখানেই রয়েছে সে।

রঞ্জনের কথায় বলে অঞ্জন।

—আর বুঝে কাজ নেই। ব্যাটার পয়সা আছে প্রেম প্রেম খেলা করছে, আমাদের কিছু নাই, বেয়ারা রাঁধুনি সেজে খেটে মরছি। যেতে দে—যে যা করছে করুক। ওসবে আমি নেই।

রঞ্জন বলে—জীবন সম্বন্ধে এত উদাসীন হোস না অঞ্জন। জীবন বহু রহস্য, বহু আনন্দে ভরপুর। খুঁজে নিতে হবে, মানুষের বিপদে তার পাশে দাঁড়াতে হবে; সত্যের জন্য—মঙ্গলের জন্য লড়তে হবে শয়তানদের সঙ্গে।

অঞ্জন বলে—এখানে ওসব পেলি কোথায় ? লড়বিই বা কার সঙ্গে ?

—ওই শয়তান বনের শত্রু, মানুষের শত্রু। ওই সর্বেশ।

ওটার লোভ শয়তানির জবাব দিতেই হবে।

অঞ্জন দেখছে রঞ্জনকে। রঞ্জন এমনিতে বেপরোয়া। কঠিন ধাতের ছেলে, আর উপস্থিত বুদ্ধিটাও বেশ ধারালো। কিন্তু এখানেও ওই সব লড়াই-এর কথা বলতে অঞ্জন বলে।

—এখানে ওসব করিস না ! ওই সর্বেশেরও লোকজন আছে, তারা বাঘ হাতি মারে, মানুষ মারতে ওদের দেরী হবে না, বিশেষ করে ওই বনের ভিতর। তাই বলছি রাঁধুনি গিরি করছিস তাই কর, বেয়ারাগিরি করছি করি। যে যা করছে করতে দে।

রঞ্জন বলে—ঘাবড়ে গেলি ? আরে লড়াইটা হবে কৌশলে, গোপনে। বুদ্ধির লড়াই, দেখবি ওর শয়তানির জবাবই দেব। মেয়েটার বিপদ হতে দেব না।

হঠাৎ মেমসাহেবকে আসতে দেখে রঞ্জন দ্রুত বাসন মাজতে মাজতে বলে।

—এ্যাই মঙ্গু, জল তুলে কাঠগুলো তুলে আন।

রাতের ডিনার তৈরী করতে হবে। চুলো জ্বালা—

মিসেস গাঙ্গুলি দেখছে ওদের কাজ। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে বলে—সব সাফ করো। রাতে চিকেন হবে, চিকেন আর রুটি, সঙ্গে সব্জী, এখন কিছু চিকেন পকৌড়া বানাতে হবে।

অর্থাৎ মদের আসর বসবে।

রঞ্জন বলে—ঠিক আছে মেমসাব। বন থেকে কিছু জমা লড়কী এনেই ওসবে হাত দেব। দেরী হবে না।

বলে সে অঞ্জনকে—কুঠার লেকে চল মঙ্গু, লকড়ি আনতে হবে।

দুজনে বের হয়েছে বাংলোর পিছনের দিকের বনে।

শালবনে তখন বৈকালের দিকে আঁধার নামছে। পাখীদের কলরব ওঠে।

রঞ্জন এই অবকাশে বনের মধ্যে কিছু দুর্লভ প্রজাতির ফার্ণ, কিছু এই অরণ্যের বিশেষ ধরণের ফুল সংগ্রহ করছে আর অঞ্জন পাহাড়ের বুকে জমে থাকা হেমাটাইট, সিলিকেটের বিশেষ ধরণের পাথর দেখে তাই সংগ্রহ করছে।

রঞ্জন বলে—এর নাম চলতি ভাষায় গোল গোলি—রক্ত লাল ফুলগুলো ফোটে শীতের শেষে, আর বুনো আটাড়ি লতা—এখানের বৈশিষ্ট্য, এ দিয়ে হাতী বাঁধা যায়।

এই বিচিত্র সুন্দর বনরাজ্যকে ওরা শেষ করতে চায়।

ঝটপট শব্দে থমকে দাঁড়ায় ওরা, গাছের ডালে শব্দটা উঠছে—দেখা যায় কয়েকটা ময়ূর এদিক ওদিকে উড়ে ডালে বসছে, একটা মদ্দা ময়ূর বিশাল পেখম মেলে ওই প্রেমিকাদের নজর কাড়ার চেষ্টা করছে।

অঞ্জন বলে—ওটা তোর সর্বেশ। মেয়েদের সামনে হিরো সাজতে চায়।

হাসে রঞ্জন, ওটা তবু আসল ময়ূর—আর ওব্যাটা শিখিপুচ্ছধারী দাঁড়কাক। আসলে দাঁড়কাক, নকল ময়ূর সেজেছে। ওর মুখোশ আমি খুলে দেবই।

সর্বেশ বের হয়েছে বনের এদিকে, মোরাম ঢালা সরু ফরেস্ট রোড। দুদিকে শাল-এর জঙ্গল। নীচে বেশ কিছু লতা গুল্মের ভিড়, স্যাঁতসেতে জায়গায় সবুজ ফার্ন রকমারি অর্কিড ফুলের বাহার। বেবী বলে।

— সন্ধ্যা হয়ে আসছে। চলুন ফেরা যাক।

আইভি নীরবে বসে আছে। সর্বেশ বলে বেবীর কথায়।

—ভয় করছে? আরে এসব বন আমার কাছে কিছুই নয়।

কত বন—কত বনের জন্তু দেখলাম। আইভি—চলনা ওদিকে অর্কিড ফুল ফুটেছে, তুলে আনি।

বেবী বলে—ওসবের দরকার নাই।

সর্বেশ বলে—ভয় কি। জিপে বসো, আসছি একমিনিট। কোন ভয় নেই।

আইভি নামতে ইতি উতি করে।

সর্বেশের সঙ্গে নির্জনে যেতেও ভরসা হয় না তার। কিন্তু বেবীর সামনে কিছু বলতেও পারে না। বাধ্য হয়ে নামলো।

সর্বেশ ওকে নিয়ে যায় ওই বুনো ফুলের রাজ্যে, আইভি বলে।

আর যাওয়া ঠিক হবে না।

সর্বেশ বলে ওর কাঁধে হাত রেখে—আমি তো রয়েছি।

আইভি দেখছে ওকে। সর্বেশও বন নির্জনে আইভিকে আরও কাছে পেতে চায়। একটা অর্কিড-এর রংবাহার ফুল তুলে ওর খোপায় গুঁজে হঠাৎ দু'হাত দিয়ে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরতে চায় সর্বেশ। অস্ফুট স্বরে

প্রতিবাদ করে আইভি—না—না—।

তারপরই আইভি ভীত বনহরিণীর মত এস্তপদে দৌড়লো ওই জিপের দিকে। প্রথমে হতাশ, পরে যেন মজা পেয়ে বোকার মত হাসছে সর্বেশ।

বনের আড়াল থেকে দেখছে রঞ্জন অঞ্জন ওই লুটেরার জবরদস্ত প্রেম নিবেদনের দৃশ্যটা। অসহায় মেয়েটাকে নির্জন বনে এনে মতলব হাসিল করতে চায় ওই সর্বেশ। মেয়েটির এতে বিন্দুমাত্র সায় নেই তাও বুঝেছে রঞ্জন।

সর্বেশ আইভিকে চলে যেতে দেখে তার পিছু পিছু গিয়ে জিপে উঠলো। আইভি জিপে উঠে বসেছে। বেবী দেখছে দিদিকে। ওর মুখ চোখ যেন গম্ভীর, থমথমে।

সর্বেশও জিপ নিয়ে বের হয়ে গেল।

এবার বন থেকে বের হয়ে আসে রঞ্জন আর অঞ্জন।

অঞ্জন বলে—ব্যাটা জানোয়ার!

রঞ্জন জবাব দেয়—এতক্ষণে বুঝলি? এবার কি করতে হবে তাই ঠিক করবো। চল। ওরাও বনের সুঁড়িপথে বাংলোয় ফেরে।

তখন বারান্দায় টেবিল সাজিয়ে বসেছে মেজর সাব।

মদের বোতল, গ্লাসও হাজির। ওদিকে সর্বেশও পায়জামা এবং পাঞ্জাবী পরে এবার মদের টেবিলে আসছে, মেমসাহেবও ঈষৎ পান করেন—অবশ্য হাতে সেই উলের কাঁটা বল তখনও থাকে।

এদের দেখে বলে—জলদি চিকেন পকোড়া, চিজ পকোড়া বানাও। কোথায় থাকো দুজনে?

মেজর সাহেব এর মধ্যে এক পেগ চালান করেছে নীট জল ছাড়াই। বলে—জলের জাগ নিয়ে এসো।

রঞ্জন কিচেনে ব্যস্ত। অঞ্জন তখন জল গ্লাস—এটা ওটা আনছে।

আইভি ঘরে ফিরেছে। ওই লোকটার সাহস ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। মাথার সেই অর্কিড ফুলটা এবার খুলে ছুঁড়ে ফেলে আইভি। গজগজ করে —ইডিয়ট। ইতর!

বেবী দেখছে দিদিকে। বেশ রেগে গেছে আইভি। বেবী শুধোয়।

—কি হল রে দিদি? সর্বেশদা কিছু—

আইভি চাপা স্বরে বলে—ওটা একটা শয়তান। কলকাতায় কোন সুযোগই দিইনি ওকে, তাই বোধ হয় এই বনে এসে একটা সর্বনাশ করতে চায়।

সেকি! বেবীও অবাক হয়। বলে সে—বাবা কে বল।

আইভি বলে—কাকে বলবো? দেখছিস না বাবা মাও এখন সর্বেশেরই দলে। স্রেফ মদ আর টাকার জন্য বাবা এখন সর্বেশেরই হাতে। স্রেফ মদ আর টাকার জন্য বাবা এমন চাকরী খুইয়ে এখন ওই শয়তানের দলেই নাম লিখিয়েছে। ওর দয়াতেই এখন আমাদের সংসার চলে। বাবা মা কিছুই বলবে না ওকে। উল্টে ওর হয়েই ওকালতি করবে। অথচ আমি জানি ওই সর্বেশ একটা সাংঘাতিক লোক, ভালো মানুষ সেজে থাকে। ওকে আমি ঘেন্না করি।

কিন্তু—কি করবো আমি!

আইভি আজ চাপা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলে।

—বাঁচার কোন পথই দেখছি না এখানে। আমি কলকাতায় ফিরতে পারলে চাকরী নিয়ে বাড়ি ছেড়ে ওই শয়তানের হাত এড়িয়ে যেখানে হোক চলে যাবো। কিন্তু এখন কি করি? কে বাঁচাবে এখানে?

ফুলে ফুলে কাঁদছে আইভি।

জানালাটা খোলা, রঞ্জন কিচেনে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঘরের ভিতরে ওদের দুই বোনের কথা শুনে দাঁড়িয়েছে, অঞ্জনও রয়েছ।

আজ ওরা জেনেছে এই সংসারের ওই জীবদের করুণ কাহিনী। জেনেছে আইভি'র চরম বিপদের কথা।

বেবীও ভাবনায় পড়ে। দিদিকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে।

—তুই ভাবিস না দিদি। এ সর্বনাশ আমি হতে দেব না।

—তুই কি করবি?

তা জানে না বেবী। তবু বলে সে।

—একটা পথ হবেই দিদি। তুই শান্ত হ, চল—কিচেনে চল, চা খাবি।

বাইরে থেকে সবই শুনেছে রঞ্জন, অঞ্জন। হঠাৎ ওদিক থেকে মেজর গাঙ্গুলির কণ্ঠস্বর শোনা যায়—মঙ্গু! চিকেন পকৌড়া—আণ্ডা ফ্রাই লে আও। চঙ্গু, পানি বোলাও।

রঞ্জন রুটি বানাবে। আটায় জল ঢালছে—আর ঢেলেই চলেছে।

হঠাৎ কার কণ্ঠস্বর শুনে চাইল।

—একি! এত জল ঢালছ? কি হবে?

আইভি এসেছে কিচেনে। রঞ্জন ওই তরল আটার মিশ্রণটাকে সামলাতে সামলাতে বলে—রুটি!

আইভি দেখছে ওকে। মুখে মাথায় আটার সাদা আস্তরণ। একেবারে নাজেহাল হয়ে গেছে আটা মাখার চেষ্টায়। আইভি বলে—রুটি হবেনা সরুচাকালি! যা জল ঢেলেছো। আরও আটা দাও— সরো দেখি!

আইভিই গাছ কোমর করে বসে এবার আটা মাখতে থাকে।

বলে আইভি—রুটি কখনও বানাও নি মনে হচ্ছে।

রঞ্জনের বিদ্যা যেন ধরা পড়ে যাচ্ছে, ওদিকে ডাল ফুটছে উনুনে। উতলে উঠতে রঞ্জন ফুঁ দিতে থাকে। তবু ফুলে ফেঁপে ওঠা ডাল বাধা মানে না, উনুনে গড়িয়ে পড়ছে।

রঞ্জন ব্যস্ত। আইভি দেখছে রঞ্জনকে।

—একটু সরষের তেল ঢেলে দাও।

তেল ঢালতে উতলানো থামলো। আইভি ততক্ষণে আটা মাখাটাকে শেষ করে বলে।

—রুটি করতে পারবে? কাল তো সব পুড়িয়ে ফেলেছিলে— আহা! এতটা নুন দেয় ডালে? আন্দাজও নেই। সরো—তাই দেখি অখাদ্যই হচ্ছে। রান্নার কিছুই জানো না। এসব কাজ কখনো করেছো বলেও মনে হয় না!

হঠাৎ অঞ্জন ঘরে ঢুকে বলে।

—বেয়ারাগিরি আর পোষাবে না। ব্যাটা মদ গিলে বেহেড হয়ে গান গাইছে ওই বুড়ো ভাম আর তার তারিফ করতে হবে? ননসেন্স!

হঠাৎ আইভিকে রুটি বানাতে দেখে থেমে যায় অঞ্জন।

আইভিও অঞ্জনকে দেখছে। ওদের দুজনেই এর মধ্যেই বেয়ারার সাদা ইউনিফর্ম আনানো হয়েছে তাই পরেছে। কাঁধে তোয়ালে। দেখতে বেয়ারার মতই কিন্তু কথাবার্তায় কলকাতার টান। মুখ চোখও মার্জিত, মনে হয় বুদ্ধিদৃপ্ত।

আইভি দেখছে ওদের।

ওই তীক্ষ্ন সন্ধানী দৃষ্টির সামনে এদের দুজনের প্রকৃত রূপ যেন ধরা পড়ে গেছে।

রঞ্জন বলে—মেমসাহেব, রুটি আমিই করে নেব।

আইভি উঠে পড়ে। বলে—দরকার হলে চিকেনটা চাপাবার সময় ডাকবে, যাতে খাওয়া যায় সেইরকম কিছু করতে হবে। কিছুই না জেনে সব জানার ভান করা ঠিক নয়।

আইভি চলে যেতেই এদিক ওদিক চেয়ে রঞ্জন বলে চাপা স্বরে—তোর ওই কলকইয়া বুলি আর ইংরাজী এসব ছাড়।

বলে—তুই যে মোটেই রাঁধতে জানিস না—এটাও ধরে ফেলেছে। আটায় এত জল ঢালে। ননসেন্স! এখন ধরা না পড়ে যাই।

রঞ্জন বলে—সাবধানে থাকবি। তবে মেয়েটা সত্যি ভালো রে। ওই আমাদের সাহায্য করছে, নাহলে তো কবে মাল ক্যাচ কট হয়ে যেতাম। বড় ভালো মেয়ে রে। ওর জন্য কিছু করতেই হবে।

সর্বেশের রাতের কারবার ভালোই চলছে।

বাংলোতে মেজর সাহেব মাল খেয়ে টোর, সবাই ঘুমুচ্ছে।

সর্বেশ বের হয় জিপ নিয়ে, রাতের অন্ধকারে তার বাহিনীও তৈরী। ফরেস্টের দু-একজন গার্ডও রাতে ডিউটি করে।

অবশ্য বন পাহারা দেবার ডিউটি নিয়ে তারা সর্বেশের কাছ থেকে বেশ কিছু টাকা খায়।

সর্বেশ জানে কোথায় ঠিক মত তেল দিলে তার এই চক্রের গতি মসৃণ হবে। বিট অফিসার নটবর সাউ বেশ করিত কর্মা লোক।

নতুন রেঞ্জ অফিসার হয়ে এসেছে তরুণ অফিসার হরলাল তেওয়ারী। বেশ কড়া ধাতের অফিসার; নটবর তার অধীনে একটা বিটের চার্জে।

হরলাল তেওয়ারী কদিন আগেই এই রেঞ্জের সব রেঞ্জ অফিসার, অধীনস্থ বিট অফিসারদের ডেকে এনে জরুরী মিটিং করেছে। তাদের সাবধানও করেছে যে বন থেকে বহু দামী কাঠ গোপনে বের হয়ে যাচ্ছে, বনে জন্তু জানোয়ারের উপরও হামলা হচ্ছে চামড়ার লোভে।

নটবর বলে—এ সব খুবই অন্যায় স্যার। আমি নিজে রাতে বনে ঘুরবো গার্ড নিয়ে। এসব যাতে না হয় দেখতে হবে।

—তাই করুন। আর অন্যদেরও বলছি সজাগ থাকতে। যাতে এসব না হয়।

…মিটিং-এ সব আলোচনাও হয়।

নটবর জানে কথায় আর কাজে ফারাক্ থাকে অনেকই। নগদ টাকার জন্যই নটবর ঘরবাড়ি ছেড়ে এই গহণ বনে পড়ে আছে, সেই নগদ নারায়ণকে হেলায় ফিরিয়ে দিতে পারে না। তাছাড়া এসব আসছে অযাচিত ভাবেই।

সর্বেশ জানে নটবর তার হাতেই এসে গেছে।

তার হাতে টাকার বাণ্ডিলটা দিয়ে বলে।

— আজ ওদিকের বনে যাবেন না। ওরা কিছু মাল সরাবে—

নটবর বলে—চুপ চাপে যেন কাজ সারে, গুলি ফুলি না চালায়। তেওয়ারী সাহেবের কান খুবই খাড়া। খুব গড়বড় করছে।

সর্বেশ ভাবছে কথাটা। এর আগের অফিসারকে হাত করেছিল। বেশ চলছিল কাজ কারবার। এখন নতুন এই অফিসার এসেই কর্তব্য-পরায়ণ হয়ে উঠেছে। ওকেও বশে আনতে হবে।

নটবর বলে—খুব কড়া অফিসার, নতুন কিনা। ঘুসও খায় না।

হাসে সর্বেশ—সেকি। ভাত রুটি যে খায় সে নিশ্চয়ই ঘুসও খায়। ঠিক আছে, ওসব পরে হবে। আজ রাতে ওদিকে যাবে না তুমি।

নটবরও ঘাড় নাড়ে।

রাত নেমেছে। তারায় ভরা মেঘমুক্ত নীল আকাশ, ঝোরার জলে তারই আভাস।

রঞ্জন নজর রেখেছিল ঘুমন্ত বাংলোর উপর।

দেখে অনেক রাতে সর্বেশ একা বের হয়ে চলেছে। রঞ্জনও পিছু নিয়েছিল তার সাবধানে।

টিলা থেকে নেমে সর্বেশ ওই ফরেস্ট কলোনীর একান্তে নটবরের বাসার সামনে এসে ওকে ওই কথাগুলো বলে ফিরছে, ও বুঝতেও পারে না যে সেই মঙ্গু তার পেছনে এসে ওই সব কথা শুনছে।

বাংলোয় ফেরে সর্বেশ।

রঞ্জনও পিছন দিক থেকে এসে তার সেই খাপরার ঘরে ঢুকে চার-পাই-এ এলিয়ে পড়ে, অঞ্জন জেগেছিল। বলে সে।

—এই রাতে কোথায় গেছিলি ?

রঞ্জন বলে এমনিই, অঞ্জন—ওই সর্বেশের ঘরে নিশ্চয়ই ওর খাতাপত্র,

ডাইরী, কাগজ চালান এসব আছে। ওগুলো আনতে হবে।

—কেন রে ?

রঞ্জন বলে—যা বলছি কর। পরে জানতে পারবি সব কিছু !

অঞ্জন বলে—জল টেনে হাত পা টন টন করছে, ঝাড়ুদারি করছি—এবার গোয়েন্দাগিরিও করাবি ? কি ব্যাপার বলতো ?

রঞ্জন বলে—বললাম তো পরে বুঝবি। এখন যা বলছি করে যা। আখেরে কাজ দেবে।

অঞ্জন বলে—এদিকে যে কাজের জন্য এলাম—কিছু কালেকসন বনের এদিক ওদিকে ঘোরা, অবজারভ করা, বটানির পাতা ফুল প্ল্যাণ্ট কালেকসন এসব চুলোয় গেল, বেয়ারা—রাধুনিগিরি করছি। ফের ওইসব।

রঞ্জন বলে—কালেকসন, বনে ঘোরাও ওসব ও তো হচ্ছে। অনেকতো এনেছিস, আমিও সব লিষ্ট করছি। কাজের ফাঁকে ওসব করে রাখ। ওসব ও হবে। এদিকের মিশন ও চলুক। বন দেখতে এসে যদি বনের একটা শত্রুকে শেষ করতে পারি সেটাও কিছু কম কাজ হবে না। নে শুয়ে পড়। সকাল থেকেই তো কাজের ফর্দ শুরু হবে।

তা এ জীবনও মন্দ নয়। দেখছিস অনেক কিছু।

—ছাই। অঞ্জন গজগজ করে।

ভোর বেলাতেই পাখীদের কলরবে ঘুম ভেঙে যায়।

হাজারো রকমারি পাখীর ডাক ওঠে। কোনটা সুরেলা—কোনটা একটানা শিষের মত, কোনটা বা গুরু গম্ভীর, সবচেয়ে বেশী কর্কশ লাগে হর্নবিল অর্থাৎ ধনেশ পাখীর ডাক। কাছেই একটা গাছে ধনেশ পাখীদের বাসা, বড় বড় পাখী গুলোর গায়ের রং নীল, হলুদে মেশান, ঠোঁট দুটোও রঙ্গীন। দেখতে নানা রং-এর, কিন্তু এত কর্কশ ওদের কণ্ঠস্বর তা জানা ছিল না, আর খুব ঝগড়াটে স্বভাবের। চীৎকার লেগেই আছে।

ওদের, চীৎকারে মেশে বনটিয়া—বন ময়নার মিষ্টি সুর। কোথায় বনের মধ্যে ঝোরার ধারে বড় ময়াল সাপের ঘুম ভাঙ্গছে ওর শব্দে, এস্ত হরিণ দৌড়ে পালায়।

পাখীদের কলরব ওঠে, ঘুম ভাঙ্গে অরণ্য জগতের। কুয়াশা ভিজে বাতাসে মেশে শাল-মহুয়া-ফুলের মিষ্টি গন্ধ। বন চাঁপা বনে বাতাস যেন মোঁ মোঁ সুবাসে মাতাল হয়ে ওঠে।

আকাশের বুকে আলোর সরণি বেয়ে আসে প্রথম সূর্যের অরুনাভা।

মেজর সাহেব গর্জন করে পাখীদের কলরবে—ইউ ব্লাডি বার্ডস্—আই শ্যাল সুট অল অব ইউ। এত চেল্লায় কেন হে সর্বেশ ওই পাখী-দের দল। ব্যাটারা ঘুমুতে দেবে না?

রঞ্জন তখন চা এনেছে।

গুড মর্নিং স্যার! মেমসাব—বেড টি!

মেজর বলে—চা পরে হবে। মদের বোতলটার তলানিটা ঢেলে দাও ইয়ংম্যান, খোয়াড়ি ভাঙ্গি, তারপর চা।

মিসেস গাঙ্গুলি বলে রঞ্জনকে।

—যাও, আমি দেখছি।

রঞ্জন চা নিয়ে গেছে। তাই সবঘরেই অবাধ প্রবেশের অধিকার রয়েছে। সর্বেশ তখনও ঘুমুচ্ছে। চা টা রেখে বলে—টি সাব।

সর্বেশ ঘুম চোখে বলে—ও কে!

আইভি'র ঘুম আসে না। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে ছিল একটু।

বেবী ওদিকের খাটে শুয়ে। রঞ্জন চা নিয়ে ঢোকে।

—চা এনেছি।

আইভি র‍্যাগটা জড়িয়ে উঠে বসে চাইল।

রঞ্জনও দেখছে ওঠে। ভোরের ভেজা পদ্মের মত স্নিগ্ধতা মাখানো ওর মুখে। চোখদুটো আয়ত, কি যেন বেদনায় টল টল করছে। রঞ্জন বলে।

—রাতে ঘুম হয়নি মেমসাব?

আইভি বলে—হ্যাঁ, শোন—মেমসাহেব আমি নই।

হাসে রঞ্জন।

বেবীও উঠে পড়ে। বলে সে।

—চঙ্গু, আমার চা?

—এনেছি ছোটা মেমসাব, গুডমর্নিং!

রঞ্জন চলে যায়। আইভি'র সঙ্গে বেশী কথা বলতে সাহস করে না ওই বিচ্ছু মেয়েটার সামনে।

বেবী চায়ে চুমুক দিয়ে বলে।

—দিদি, ওই চঙ্গু মনে হচ্ছে তোর প্রেমে পড়ে গেছে রে!

যেভাবে চেয়ে দেখছিল তোকে।

ভ্যাট! সকালে বাঁদরামি শুরু করলি!

আইভি'র কথায় বলে বেবী।

—বাঁদরামি নয় রে, দ্যাটস মাই অবজারভেশন।

উঃ, বনে তাহলে তোর দু'দুটো প্রেমিক জুটে গেল। একজন সর্বেশ সরি সর্বেশ দি গ্রেট অন্যজন চঙ্গু দি কুক। আমার বরাতে একজনও জুটলো না রে!

আইভি চা খেয়ে বাথরুম সেরে বের হয়ে পড়ে বাংলো থেকে নীচের ওই পথটা বেয়ে।

শান্ত সুন্দর বনভূমি—ঝোরার বারবার শব্দ ওঠে।

পাখীর ডাকে ভরা চারিদিক, সরু পথটা ঝরা শালফুলে ঢেকে গেছে, পায়ে পায়ে আইভি এগিয়ে চলে কোন রূপরাজ্যের দিকে।

তার জীবনে শান্তি নেই—চারিদিকে লোভী শয়তানের থাবা, তাই যেন বনের গভীরে প্রশান্তির সন্ধান করে সে।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নেয়—সব জ্বালা যেন জুড়িয়ে আসে।

বনকে একদল দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়ে। অন্য অনেকে দেখে চোখের লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে। একদল মানুষ আজও চায় প্রকৃতির লীলাভূমি, এই রূপজগৎ অফুরান হয়ে থাকুক।

অন্যদল চায় টাকা! ওই বনের গাছকে তারা টাকার হিসাবে—লগ, স্কোয়ারফিট-এর দর কষে দেখে। টাকার জন্য তারা বনভূমিকে শেষ করেছে, মরুভূমির লোভী হাতটাকে তারা মজবুত করে তুলেছে টাকার জন্য।

সর্বেশ জানে ফরেস্টের কর্মীদের ধরতে গেলে সকালেই আসতে হবে। নাহলে ওরা সকালের পরই বনে বের হয়ে যায়, এদিক ওদিক ঘোরে—বনের গাছগুলোকে তারা ভালবাসে—তাদের চেনে। ওই বনকে সাজাবার স্বপ্ন দেখে তারা।

হরলাল তেওয়ারী তেমনি একজন বনকর্মী।

চাইবাসা ফরেস্ট ট্রেনিং স্কুলে তার ট্রেনিং, তারপর দেরাদুন গেছে, ঘুরেছে ভারতবর্ষের বহু অরন্য অঞ্চল, তরাই-এর শালবন থেকে মধ্য প্রদেশের বন—নীলগিরির মধুমাল্লাই—বন্দীপুর অরণ্য অঞ্চলেও বহু ঘুরেছে।

এখানে পোস্টিং পেয়ে এসেছে হরলাল আর কিছুদিনের মধ্যেই ঢের

পেয়েছে যে এই জঙ্গল থেকে একটা চক্র বেশ দামী মালই পাচার করে চলেছে, বে-আইনী গাছ কাটাইও চলেছে।

হরলাল তেওয়ারীও খোঁজ খবর করছে।

সেদিন সকালে হরলাল অফিসে বসে কাজ করছে।

কত ট্রাক মাল গেছে, তাদের পারমিট এসব চেক করতে গিয়ে মনে হয় কিছু পারমিট যেন জালই। ওর স্ট্যাম্পও ঠিক নয়। তেমনি বেশ কিছু চালান দিয়ে অনেক মাল পাচার হয়েছে।

···একটু অবাক হয় হরলাল।

—নমস্তে!

ঢুকছে সর্বেশ। হরলাল চাইল ওর দিকে।

সর্বেশও দেখছে হরলালকে ওইসব জাল চালান পরখ করতে, ব্যাপারটা জানে সর্বেশ। তার দলের লোকদেরই কাজ এসব।

সর্বেশ তাই ওসব ব্যাপার সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করতে চায় না।

হরলালও দেখছে ওকে।

সর্বেশ বলে—আপনাদের ফরেস্ট বাংলোয় এসে রয়েছি ট্যুরিস্ট হিসাবে,। সুন্দর বন, অপূর্ব পরিবেশ। সরকারী আইনে আপনিই হোস্ট, তাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এলাম, নিন।

হরলালের দিকে এগিয়ে দেয় দামী ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেটের প্যাকেট। নিষ্ঠাবান বনকর্মীরা সাধারণতঃ ধূমপান করেন না, কারণ দূর দুর্গমে থাকতে হয় তাদের। সিগারেট সে সব জায়গায় মেলে না, আর বনে শীতের শেষে ঝরাপাতার স্তূপ পড়ে থাকে—একটা অসতর্ক দেশলাই কাঠি সারা বনের বিপদ ডেকে আনতে পারে। তাই বনকর্মীরা ধূমপান বড় একটা করে না।

হরলালও তাদের দলে, বলে সে।

—ধন্যবাদ, ওসব আমার চলে না।

সর্বেশ যেন হতাশই হয়, বলে হরলাল।

—কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো বাংলোয়? এদিকে কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি, দেখা সাক্ষাৎও করার সময় নেই।

সর্বেশ বলে—না, না। কোন অসুবিধা হচ্ছে না। বাই দি বাই, আপনার জন্য কিছু ভালো স্কচ হুইস্কির ব্যবস্থাও করেছি, আসুন না সন্ধ্যায় বাংলোতে। আলাপ-পরিচয় হবে, মেজর সাহেবও খুশি হবেন।

হরলাল একটু অবাক হয়, ওকে অযাচিত ভাবে দামী মদ খাওয়াবার কথা শুনে, বলে হরলাল।

—ওসবও চলে না। অবশ্য সময় পেলে যাবো বাংলোয় এক কাপ চা খেয়েই আসবো।

সর্বেশ এবারও হতাশ হয়। শুকনো গলায় বলে—চা ! ঠিক আছে।

হরলাল বলে—এই বন কেমন লাগছে ?

—ফাইন, দারুণ শালগাছ। একেবারে ভার্জিন ফরেস্ট। হরলাল জানায়—কিন্তু কতদিন এসব রাখা যাবে জানি না।

– কেন ? একেবারে সাধু সেজে যায় সর্বেশ।

হরলাল বলে – চোরা কাটাই-এর দল এখানেও হানা দিয়েছে, বে-আইনী ভাবে কাঠ পাচার করছে বন কেটে, হাতি, বাঘ, হরিণ, বাইসনও মারছে, দাঁত শিং চামড়ার জন্য। এসব বন্ধ করতেই হবে। আমি ওদের ছাড়বো না। যে ভাবে হোক ধরবোই ওদের, এসব বন্ধ করতেই হবে।

সর্বেশও সায় দেয়—নিশ্চয়ই। এতবড় অসামাজিক অপরাধকে মেনে নেওয়া যায় না। যারা এসব করে তারা দেশের শত্রু।

হরলাল বলে—কারেক্ট। ওদের শেষ করবোই যে ভাবে হোক।

সর্বেশও বুঝেছে এই তরুণ ফরেস্ট অফিসারকে খুব সহজে হাতে আনা যাবে না। আর একটু দেখতে হবে ওকে, একটু না ক্ষেত্র তৈরী করে টাকাকড়ির লোভ দেখালে বিপদ হবে। তাই সর্বেশ আর ওদিকে গেল না। একথা সেকথার পর উঠে পড়লো।

হরলাল দেখছে ওকে।

ওর মনে হয় দামী সিগ্রেট, বিদেশী মদ এসব-এর লোভ কেন দেখাতে এসেছিল ওই ভদ্রলোক। নিছক আতিথেয়তা না অন্য কিছু ঠিক ঠাওর করতে পারে না।

কিছুটা হতাশ হয়েই ফিরছে সর্বেশ।

লোকটা যে চোরাকাটাই-এর ব্যাপার জেনে গেছে আর ওসব আটকাবার চেষ্টা করছে এটাও জেনেছে। কে জানে তার বাড়া ভাতে ছাইই না দেয় ওই ব্যাটা ফরেস্ট অফিসার।

সর্বেশ যত তাড়াতাড়ি পারে এখানের লুটপাট সেরে মোটা টাকা

কামিয়ে নিয়ে সরে পড়তে চায়।

অবশ্য যদি ওকে হাতে আনতে পারে তাহলে ব্যবসা ভালোই চলবে, কিন্তু সে লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না আপাততঃ।

ফিরছে সর্বেশ বনের পথে।

সকালের সোনারোদ গেরুয়া রং ধরছে। শান্ত বনভূমি—সর্বেশ ফিরছে চিন্তিত মনে, কারণ হরলালকে দেখে খুব খুশি হয় নি সে।

আইভি বের হয়েছে সকালে বাংলো থেকে।

এই বাংলোর পরিবেশও তার ভালো লাগে না। সর্বেশ কে নিয়ে মা বাবাও বেশ বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। আইভি'র মনে হয় ওদের জন্য খরচ খরচা করে সর্বেশও ভাবে যেন আইভি'র উপর তার একটা অধিকারও এসে গেছে।

এটা আইভি সহ্য করতে পারে না।

সর্বেশকে এড়িয়েই চলতে চায়, কলকাতায় ফিরে একটা চাকরী পেলে সে বাড়ি থেকে সরে যাবে ওই সর্বেশের হাত এড়াবার জন্যই। কোনও মেয়েদের হোস্টেলে গিয়ে থাকবে।

সকালেই বের হয়ে এসেছে আইভি একা বনের নিভৃতে। এই শান্ত পরিবেশে তার বিব্রত মন যেন কি শান্তি পায়।

ঝোরার ঝর ঝর শব্দ ওঠে, পাখী ডাক বনে বনে।

একটা কটরা হরিণ ওদিকে বনের নির্জনে চরছে। একটা ময়ূর ডানা ঝাপটিয়ে এ ডাল ও ডাল করছে। বাতাসে মিশেছে ঝোরার সুর।

ওই সুর যেন আইভি'র মনেও সুরের পরশ আনে।

গুণগুণ করে গাইছে সে।

—আমি চঞ্চল হে—সুন্দরের পিয়াসী—

এই গানের গায়িকাও সে, শ্রোতাও সে। এই বনভূমির বুকে সুরটা ছড়িয়ে পড়ে, তন্ময় হয়ে গাইছে আইভি। গান শেষ হতেই হঠাৎ কার কর্কশ গলার শব্দে চাইল আইভি।

সর্বেশ ফিরছিল বাংলোতে এই বনের পথ ধরে, সেও ঝোরার প্রবহমান জলধারার পাশে একটা পাথরে বসে একা আইভিকে এখানে তন্ময় হয়ে গান গাইতে দেখে দাঁড়ায়।

এবার গান শেষ হতে বলে সর্বেশ।

—অপূর্ব।

চাইল আইভি—আপনি?

সর্বেশ এগিয়ে যায় ওকে একা দেখে। পাশের পাথরটাতে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলে সর্বেশ।

—তোমার গান শুনে মন্ত্রমুগ্ধের মত চলে এলাম।

কি দারুণ গাও তুমি আইভি! মনে হয় তোমার ওই সুরের ঝর্ণা ধারায় নিজেকে চিরদিনের জন্য ভাসিয়ে দিই।

—তাই নাকি! আইভি ভীত হলেও সেটা প্রকাশ করে না। সহজ ভাবেই কথা বলার চেষ্টা করে।

সর্বেশ এবার ওকে দেখে এগিয়ে আসে কাছে। সর্বেশ দুটো হাত দিয়ে হঠাৎ আইভিকে জড়িয়ে ধরে বলে।

—এ আমার মনের কথা আইভি। এতদিন ধরে তোমার জন্য ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করেছি, তুমি বার বার দূরে সরে গেছো। আজ, আজ তোমাকে কাছে পেয়ে আমার মনের কথাটা জানাতে চাই আইভি।

আইভিকে সে নিবিড় আলিঙ্গনে যেন পিষে ফেলতে চায়। আইভি নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে ওই আলিঙ্গন থেকে।

—আঃ ছাড়ুন, প্লিজ!

সর্বেশ যেন বনের হিংস্র ময়াল সাপের মত আজ তার শিকারকে পাকে পাকে জড়িয়ে তার সবকিছু লুটে নিতে চায়। বন্দিনী আইভি ছটফট করছে মুক্তির জন্য, কিন্তু পারে না।

দুচোখে তার আতঙ্ক, প্রাণপণে চেষ্টা করছে সে, কিন্তু সর্বেশও আজ তাকে গ্রাস করতে চায়।

হঠাৎ এমন সময় টং টং টং করে একটা বিচিত্র শব্দ ভেসে ওঠে কাছেই। কার বেসুরো গলার হাঁক ভেসে আসে।

—মেমসাব! ব্রেকফাস্ট রেডি। টেবিলমে আ যাইয়ে, সাব লোগ্—

সর্বেশ ওই বিচিত্র শব্দে আর হেঁড়ে গলার ডাকে আইভিকে ছেড়ে দেয়, আইভিও সরে যায় চকিতের মধ্যে। দেখা যায় কুক ওই চঙ্গু একটা প্লেটে চামচ দিয়ে ঘা মেরে ঘণ্টার শব্দ তুলে বলে।

—সেলাম সাব, ব্রেকফাষ্ট রেডি। চলিয়ে টেবিলমে—

সর্বেশ বিরক্তি ভরে উঠে লম্বা লম্বা পা ফেলে বাংলোর দিকে চলে গেল।

আইভিকে যেন এযাত্রা একটা চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছে ওই চঙ্গুই। অবশ্য বনের আড়াল থেকে সব দেখেই চঙ্গু আইভিকে ওই শয়তানের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যই এই বিচিত্র ঘণ্টাধ্বনি করেছে, এসে পড়েছে এখানে।

সে কথা অবশ্য মুখে বলে না চঙ্গু। যেন কিছুই দেখেনি, জানে না। ব্রেকফাষ্ট খাবার কথাই বলেছে সে।

চঙ্গু বলে—চলিয়ে মেমসাব, বড় মেমসাব বুলায়া—

আইভিও উঠে পড়ে ওর পিছু পিছু বাংলোয় উঠে আসে। যেন কিছুই হয়নি। তবু আইভি আজ বেশ বুঝেছে ওই চঙ্গুই তাকে চরম সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

চঙ্গু অবশ্য উপরের কিচেন থেকে নজর রেখেছিল বনের মধ্যে ওই আইভি'র দিকে। ওর গানও ভেসে আসছিল, যেন মুক্ত বিহঙ্গের সুর।

হঠাৎ ওদিক থেকে সর্বেশকে আসতে দেখে এমনি একটা কিছুই ভেবে নিয়েছিল, তাই হঠাৎ বুদ্ধিটা বের করে সোজা পাকদণ্ডী বেয়ে নেমে এসে ওই কাণ্ডটা বাধিয়েছে চঙ্গু।

সর্বেশ ফিরে এসেছে বাংলোয়।

মেজর গাঙ্গুলি তখন রোদ পোয়াচ্ছে, আর মিসেস গাঙ্গুলি সেই বোনার কাজ শুরু করেছে।

সর্বেশ বলে—ব্রেকফাষ্ট দিয়েছে?

ব্রেকফাষ্টের কোন চিহ্নই নেই। অথচ চঙ্গু গেছল তাদের ডাকতে। ওইভাবে, মিসেস গাঙ্গুলি বলে?

—দেখছি।

ব্যাপারটা বেবীরও নজর এড়ায় নি।

সে ছবির ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল। দেখছে চঙ্গুকে প্লেট চামচ হাতে ছুটে নামতে। তারপরই দেখা যায় বিরক্ত সর্বেশদাকে, ওদিকে আসছে আইভি।

চঙ্গু গিয়ে কিচেনে ঢুকেছে! আইভিকে ঢুকতে দেখে বেবী বলে।

—সর্বেশদা ঝোরার ধারে গেছল, না রে?

আইভি'র সারা মনে তখনও জ্বালা। জ্বালাভরা কণ্ঠে আইভি বলে।

—ছাড়তো ওটার কথা। লাইফ হেল করে দেবে দেখছি।

বেবী বলে—না রে, দেখবি পথ একটা হবেই। চঙ্গুটা বেশ ইনটেলিজেণ্ট মনে হয়।

মায়ের ডাক শুনে চাইল ওরা।

—ব্রেকফাষ্ট হয়ে গেছে, আয় তোরা?

রঞ্জন ক'দিনেই বেশ উন্নতি করেছে। টোস্ট, মাখন, জ্যাম, ওমলেট, কলা সবই সাজিয়ে দিয়েছে টেবিলে।

ওদিকে অঞ্জন ঘামছে আর ঘর সাফ করছে।

মিসেস গাঙ্গুলি বলে—মঙ্গু! জুতোগুলো ওঘরে নিয়ে গিয়ে সাফ করে রাখ'!

সর্বেশ বলে—একটু পরে আমাকে একটু ম্যাসেজ করে দিও। বসে বসে যে বাত ধরে গেল বাবা।

মঙ্গু অর্থাৎ অঞ্জন এবার যেন রাগে ফেটে পড়বে।

কিন্তু রঞ্জন অর্থাৎ চঙ্গুই বলে।

—ও খুব ভালো ম্যাসেজ ভি করে সাব।

দুপুর নামছে।

কিচেনে রঞ্জন ব্যস্ত। আইভিকে ঢুকতে দেখে চাইল।

আইভি বলে—দাও, সব্জীগুলো কেটে দিই।

হাসে আইভি ডালে নুনটা আমি দিচ্ছি।

নিজেই ভাতের হাঁড়িতে হাতা দিয়ে বলে।

—একি! একি পিণ্ডি পাকাচ্ছো? নামাও।

তড়বড় করছে রঞ্জন। আইভি বলে।

—নাড়ো, পুড়ে যাবে যে। আমিই ভাতটা নামিয়ে দিচ্ছি। ফ্যান গেলে দিচ্ছি।

আইভিই সকাল বিকাল এসে হাত লাগায়। আইভি বলে—এসব কাজ করোনি তবু কেন বললে যে জানো?

রঞ্জন বলে—পোড়া পেটের দায়ে মেমসাহেব!

আইভি দেখছে ওকে! বলে সে।

—মিথ্যে কথা!

—না মেমসাহেব।

ওই মঙ্গুও বেয়ারাগিরি কখনও করেনি, ঝাঁটাই ধরতে জানে না।

রঞ্জন জবাব দেয় ওর খবর জানিনা, পথে দেখা।

এখানে কাজ পেয়ে চলে এলাম আপন গড।

আইভি ওর মুখে ইংরাজী শুনে চাইল। সেটা বুঝতে পেরে রঞ্জন বলে—হোটেলে দু'চারটে ইংরাজী শিখেছিলাম।

আইভি বলে—সব্জীতে এইটুকু নুন আর এইটুকু লঙ্কা দেবে—ভাল করে ভাজবে আগে মশলা দিয়ে।

—সব জানি!

—ছাই জানো! আইভি চলে যায়?

আইভি'র এই সাহায্যের জন্য তবু কোনরকমে রান্না করতে পারে চঙ্গু। কিন্তু মঙ্গু অর্থাৎ অঞ্জনের অবস্থা সত্যিই শোচনীয় হয়ে উঠেছে।

ওদিকে সর্বেশকে তখন মালিশ করছে অঞ্জন! ওর হাত পা টিপতে হয়। অঞ্জন ওই সেবাপর্ব সেরে এবার তাদের ঘরে সাহেব, মেম-সাহেবদের কয়েক জোড়া জুতো নিয়ে পালিশ করতে বসেছে।

রঞ্জন বলে—কি করছিস?

অঞ্জন গর্জে ওঠে—জুতো পালিশ মালিশ সবই তো হ'ল। এবার কি বানাবি রঞ্জন?

রঞ্জন চাপাস্বরে বলে—আঃ! চুপ কর? আর ক'টা দিন, তারপরই সব ব্যবস্থাই হবে। জুতো সাফ করে রাখ, সাহেবরা বেড়াতে বের হবে বৈকালে, তখন সর্বেশের কাগজপত্র হাতাতে হবে।

—কি হবে তাতে?

রঞ্জন বলে—হবে ব্রাদার, এভরি ক্লাউড হ্যাজ এ সিলিভার লাইনিং, সব মেঘের গায়েই রূপালী সূর্যের আভা থাকে রে, সব রাত্রিরই শেষ হয়।

অঞ্জন বলে—আজ কিছু কালেকসন করতে হবে, ওদিকের পাহাড় থেকে ডালামাইট, মাইকা ইজেলও দেখেছি। ম্যাঙ্গাজীন কোবাল্টও রয়েছে এখানের পাহাড়ে।

রঞ্জন বলে—এখানের বনও তেমনি সমৃদ্ধ, কতরকম রেয়ার ভ্যারাইটি গাছপালা, ফার্ণ অর্কিড রয়েছে, কালেকসন কতটুকুই বা হল!

—তবে পড়ে আছিস কেন?

রঞ্জন বলে—মেয়েটাকে বাঁচাতে হবে ওই শয়তানের হাত থেকে। এও বনকে বাঁচাতে হবে। আর তা করবোই!

আইভি যাচ্ছিল বাইরের পথ দিয়ে। ওদের কথাগুলো কানে আসে তার।

প্রথম থেকেই আইভি'র একটা সন্দেহ জেগেছে ওই দুটি তরুণের সম্বন্ধে। ওরা কেউই রাধুনি বেয়ারা নয়। অথচ এভাবে কেন পড়ে আছে তা জানে না।

আর ওই চঙ্গুকে তারও ভালো লেগেছে। ভদ্র চোখেমুখে মার্জিত রুচির ছাপ, তার জন্য ভাবে, তাকে বাঁচাবার চেষ্টাও করছে।

সরে যায় আইভি।

সর্বেশ বৈকালে জিপ নিয়ে বেড়াতে বের হচ্ছে। মিসেস গাঙ্গুলিও এর মধ্যে সেজেছে। চড়া মেকআপ করেছে, বেবী বলে।

—মা, বনের মধ্যে এসব দেখবে কে ?

মিসেস গাঙ্গুলিও এই বয়সে যুবতী সাজতে চায়। মেয়ের কথায় মিসেস গাঙ্গুলি বলে—থাম তো ! বড্ড বাজে কথা বলিস।

মেজর গাঙ্গুলিও সেজেগুজে বন্দুক নিয়ে বের হয়েছে। মিসেস গাঙ্গুলি বলে।

চঙ্গু, মঙ্গু, বাংলোতে থাকবে। আমরা ফিরে আসছি।

জী মেমসাব। চঙ্গু ঘাড় নুইয়েই সায় দেয়।

জিপটা বের হয়ে যায়, এবার রঞ্জন বলে।

—অঞ্জন, শুরু কর অপারেশন।

ওরা দুজনেই এবার সর্বেশের ব্যাগ কিডব্যাগ খুলে হাতড়াতে থাকে, বিশেষ কাগজপত্র, কিছু মেলেনা। হঠাৎ তোষকটা তুলে একটা ডাইরী আর বেশকিছু কাপজপত্র, চালান এসব পেয়ে যায়। সর্বেশের নিজের হাতে লেখা কিছু হিসাব, আদিবাসী সর্দার—লোকজন—মায়, নটবরকে দেওয়া টাকার হিসাব, লালাজীর কাঠের গোলার চিরকুট, ফর্দ এসবও মিলে যায়।

রঞ্জন বলে - ব্যাটা তো লুট করছিল রে সারা বন। লাখ কয়েক টাকা আমদানী করেছে এই করে।

অঞ্জন বলে -- এখন কি করবি ?

রঞ্জন কাগজপত্রের থেকে কিছু দামী কাগজ, চালান-চিরকুট সরিয়ে নিয়ে বলে—সব নিস না, কিছু নিলাম মাত্র।

ওরা কাজ সেরে সেইসব কাগজ এনে তাবড়া বেঁধে কিচেনের মটকাতে সাবধানে রেখে দিয়ে এবার নিজেদের কাজ সারতে থাকে।

ক'দিন ধরে বেশ কিছু ফুল-পাতা-অর্কিড সংগ্রহ করেছিল রঞ্জন

সেগুলো তার এ্যালবামে সাঁটতে থাকে, নোট করতে থাকে। অঞ্জন ও ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

শান্ত অরণ্যে বৈকালের আলো ম্লান হয়ে আসে।

জিপের শব্দ ভেসে আসে নীচে থেকে। লালধুলো উড়িয়ে শান্ত বনরাজ্যে মূর্তিমান অশান্তির মত সর্বেশের জিপটাকে আসতে দেখে ওরাও তাদের কাগজপত্র সামলে এবার কিচেনে ঢোকে রঞ্জন, অঞ্জন পাম্প করে জল তুলতে থাকে।

—চা লাগাও চঙ্গু! জলদি -

মেজর সাহেব জিপ থেকে নেমেই হাঁক পাড়ে।

সকালে রঞ্জন অঞ্জন কাঠ আনার ছল করে বের হয়। আজ রঞ্জন বের হয়েছে। আর এসেছে ফরেস্ট কলোনীতে রেঞ্জ অফিসারের সন্ধানে। তার বনে এতবড় কান্ড ঘটছে তাকে জানাতেই হবে।

রঞ্জন জানে তার কাকা শমনদমন ব্যানার্জী এই বনের বাইরেই আয়রণ ওর মাইনস্ অঞ্চলের নামীদামী লোক। এখানের এম পি তিনি, তার কাকাবাবুর ছেলে পুলে নেই, রঞ্জনকেই পুত্রবৎ স্নেহ করেন।

তিনি জানেন না যে রঞ্জন এখানে আছে এই ভাবে, জানতে পারলে রঞ্জন অঞ্জন দুজনেরই বিপদ হবে। তবু রঞ্জন ভেবেছে রেঞ্জ অফিসার সাহায্য না করলে বাধ্য হয়েই কাকাবাবুকেই জানাবে সব কথা।

তবু আশা নিয়েই এসেছে ফরেস্ট কলোনীতে।

হরলাল তেওয়ারী গত রাতে বনে গেছল।

তার চোখের সামনে দিয়ে একটা ট্রাক বের হয়ে যায়, কিছুটা তাড়াও করেছিল, কিন্তু ট্রাক থেকে কারা গুলি চালাতে হরলালের জিপের টায়ার ফেঁসে গেছল।

তাদের ধরতে পারে নি হরলাল।

বেশ ক্ষুব্ধ জ্বালাভরা মন নিয়েই ফিরেছে সে। এবার তৈরী হয়েই বের হবে।

অফিসে বসে আছে, হঠাৎ রঞ্জনকে ঢুকতে দেখে চাইল হরলাল তেওয়ারী। চেনা মুখ!

রঞ্জনও অবাক তার পুরোনো সহপাঠীকে দেখে।

দুজনে একসঙ্গে বোটানি নিয়ে পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স করেছে। তারপর রঞ্জন ডক্টরেট করে প্রফেসারী করছে আর ইণ্ডিয়ান ফরেস্ট সার্ভিস পরীক্ষা

দিয়ে হরলাল ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টে গেছে।

দু'জনের দেখা হয়ে যায় হঠাৎ নাটকীয় ভাবেই।

হরলালও খুশি হয়—রঞ্জন, তুই এখানে ?

রঞ্জন বলে—এমনি বেড়াতে এসেছি সারান্দার বনে, কিছু নতুন স্পেসিজ স্টাডি করতে চাই।

হরলাল বলে—দারুণ সাবজেক্ট আছে তোর জন্য এখানে। রয়েছিস তো, চল দেখাবো। তবে এমন সুন্দর বন আর কতদিন থাকে কে জানে ? একদিকে পাহাড়ের পর পাহাড় এর গাছ পালা কেটে ব্লাষ্টিং করে আয়রণ ওর তোলা হচ্ছে, তবু কিছু বনকে রাখা হয়েছিল, সেই বনেও এবার চোরাকাটাই হয়, কাঠ চুরি যায়, হাতি, বাঘ—চিতা—হরিণ মারা শুরু করেছে চোরা শিকারীর দল, বেশ আট ঘাট বেঁধেই তারা এসব করছে। ধরতে পারা যায় না সেই মাথাদের, ধরা পড়ে দু একজন চুনোপুটি মাত্র। ওরাই বহু বনকে শেষ করেছে এবার এই বনের পালা।

কি ভাবছে রঞ্জন।

এর মধ্যে চা এসে গেছে। রঞ্জন অঞ্জনকেও হরলালের কাছে আনেনি। অঞ্জন কিছু কাঠ নিয়ে ফিরে গেছে বাংলোয়।

সেখানে গিয়ে জানাবে আদিবাসী বসতিতে গেছে চঙ্গু কিছু আনাজ-পত্র, ডিম-এর সন্ধানে।

রঞ্জন অঞ্জনকেও সব ব্যাপারটা জানাতে চায় নি।

এবার রঞ্জন বলে হরলালকে।

—ওই চোরাচালানের একটা মাথার সন্ধান দিতে পারি।

হরলাল বলে—কিন্তু প্রমাণ, সাক্ষী, এসব তো চাই !

রঞ্জন বলে—সেটা তোকেই যোগাড় করতে হবে। হাতে নাতে ধরতে পারলেই কাজ হবে।

—কিন্তু কে সেই মহাত্মা ? তুই তার সন্ধান পেলি কি করে ? কোথায় থাকেন তিনি ?

হরলালের কথায় বলে রঞ্জন।

—আপাততঃ এখানেই আছে, তোর এলাকাতেই। তবে মাল কলকাতার।

—আমার এখানে আছে আপাততঃ! অর্থাৎ এখন যে সব অপকর্ম চলছে তারই ইঙ্গিতে?

—হতে পারে।

সর্বেশের নাম, বর্ণনা, বর্তমান ঠিকানা জানাতে হরলাল-এর সামনে সর্বেশের ছবিটা ফুটে ওঠে।

বলে সে—ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগ্রেট খায়, গোঁফ ইয়া এক জোড়া। মদও খান। সন্ধ্যায় বাংলোতে মহফিল বসায়?

অবাক হয় রঞ্জন—তুই এসব কি করে জানলি?

হরলাল বলে—এখানে এসেছিল। বোধ হয় আমাকে হাতে আনার মতলবে। সন্ধ্যায় স্কচ খেতে নেমতন্নও করেছিল বাংলোয়।

রঞ্জন বলে—ওই মূর্তিই। রাতেও জিপ নিয়ে বের হয়।

দিনেও।

হরলাল বলে—ওর ওপর নজর রাখছি, বাংলোতেও যাবো তাহলে! আর তুইও নজর রাখ, কিছু প্রমাণ চাই—তাহলেই ওকে সযুত করে দেব।

রঞ্জন বলে তার বর্তমান অবস্থার কথা।

বাংলোতে এখন কুক হয়ে রয়েছে। আর তার নাম সেখানে রঞ্জন নয় চন্দ্রবদন ওরফে সে এখন চঙ্গু বলেই পরিচিত।

হাসছে হরলাল। রঞ্জন বলে।

—গেলেও আমরা কেউ কাউকেই চিনবো না। আর তুই বনে নজর রাখ, প্রমাণ কিছু নিশ্চয়ই হাতে পাবি।

উঠে পড়ে রঞ্জন—চলি, বস্তিতে আনাজ-পত্র, ডিম কিনতে এসেছি বলে জানে ওরা।

—ব্রেকফাস্ট এখনও রেডি হয় নি! কোথায় থাকো রাস্কেল?

গর্জে ওঠে সর্বেশ রঞ্জনকে ঢুকতে দেখে। বলে চলেছে সে।

—আমাকে কাজে বের হতে হবে! ননসেন্স।

রঞ্জন ওরফে চঙ্গু বলে।

বস্তিতে গেছলাম আণ্ডা, সবজীর সন্ধানে।

— ফের জবাব। জুতিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব রাস্কেল।

আইভি বলে—ডিম নাহলে ওমলেট জুটবে না—খুঁজে খুঁজে আনতে

হবে তো গাঁ থেকে।

সর্বেশ বলে—ওই সব অপদার্থ কামচোট্টাদের প্রশ্রয় দিও না আইভি

তারপর যেন পরম দয়া করে বলে চঙ্গুকে।

—যা, ফের কোন দিন দেরী হলে—

মেজর গর্জে ওঠে—আই শ্যাল ড্রাইভ ইউ আউট, লাথি মেরে বের করে দেব। নো এক্সপ্লানেশন—যাও।

চঙ্গুকে নেহাৎ লাথিটা মারেনি সর্বেশ এই যেন তার ভাগ্য, অঞ্জন ওরফে মঙ্গুও দেখেছে সব, সেও রেগে গেছে। তবু চঙ্গুর ইশারাতে জবাব দিল না।

আইভি'র এই সব মেজাজ মোটেই ভালো লাগে না, সেও বুঝতে পারে না ওরা কেন এখানে পড়ে আছে।

সর্বেশ বলে—পরশু এখানে হাট বসবে, হাট থেকে বেশী করে ডিম—মুরগী—আনাজ-পত্র কিনে রাখতে হবে সাব্।

মেজর বলে—কারেক্ট! আদিবাসীদের হাট—তাহলে তো ইয়ে ওদের নাচগানও হয়, আর দ্যাট মহুয়া—ওসবও মেলে?

সর্বেশ বলে—মহুয়া, হাড়িয়া ওসব তো এখানে ঢেলে বিক্রী হয়, ওসব গিলে মাতাল হয়ে নাচ গানও হয় ওদের।

মেজর খুশি হয়—ভেরি গুড, তাহলে পরশু হাটে যেতেই হবে। কি বল সর্বেশ।

মিসেস গাঙ্গুলি বলে—যাবে যাও, তার বাড়াবাড়ি করলে আই শ্যাল কিক্ ইউ আউট, নো এক্সপ্লানেশন!

হাসছে মেজর গাঙ্গুলি। ওসব তার গা সওয়া হয়ে গেছে। এখন পরের ঘাড়ে পরগাছা হয়ে রয়েছে তাতেও লজ্জা অপমান বোধ নেই, তবে ওই ফোঁপরা ঢেঁকির মত মিলিটারী মেজাজই রয়ে গেছে।

কিন্তু স্ত্রীকে বরাবরই সমীহ করে মেজর, তাই এখনও চুপ করেই রইল।

কাজ সারতে বেলা একটা বেজে যায়।

কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম পায় এখন রঞ্জন আর অঞ্জন।

অঞ্জন বলে—আমি তো ঝাড়ুদার, মালিশওয়ালা-বুট পালিশ সবই হলাম, ওই ব্যাটা তোকে যা তা বলবে চুপ করে থাকবি?

রঞ্জন এবার এখানে হরলালকে দেখে সাহস পেয়েছে, ওর হাতে

সর্বেশের সেই সব চোরাচালানের কাগজপত্রগুলো তুলে দিতে পারলে কাজ এগিয়ে যাবে, ওই সর্বেশের মুখোস সে খুলে দেবে ; বলে রঞ্জন।

—ক'দিন চুপচাপ থাক। সব কিছুরই জবাব ওকে দেব।

—কখন? কবে?

হাসে রঞ্জন—সময় হলেই দেখবি, চল—

তাদের ঘর থেকে বনে বের হয়ে যায় তারা। কিছু স্পেসিমেন সংগ্রহ করে, আজ রঞ্জন হরলালের সঙ্গেও বনে দেখা করবে। আর সেই কাগজগুলো তুলে দেবে ওর হাতে। অফিসে এসব করা ঠিক হবে না, সর্বেশের লোক সেখানেও আছে। তাই বনের একটা জায়গাতেই দেখা হবে তাদের।

আইভিও কথাটা ভেবেছে।

আজ সকালেও চঙ্গুকে যা তা কথা বলেছে সর্বেশ। আইভি জানে কারণটা। চঙ্গু তাকে ওর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এসব করে। আর সর্বেশ তাতে খুশি নয়, তাই ওকে তাড়াতে চায়, অপমান করে।

কিন্তু আইভি'র বার বার মনে হয়, স্রেফ টাকার জন্য ওরা কুক, বেয়ারাগিরি করতে আসেনি। চঙ্গুদের কথায়, চেহারায় একটা মার্জিত রুচি, বুদ্ধিমত্তার ছাপ আছে। রাঁধুনি বেয়ারাগিরিও করেনি তা বুঝেছে আইভি।

শান্ত দুপুর, সকলেই ঘুমুচ্ছে।

সর্বেশ বের হয়ে গেছে কি কাজে। আইভি চুপ চাপ ওই আউট হাউসের দিকে আসে।

শান্ত নির্জন পরিবেশ।

দরজাটায় শিকল দেওয়া—চঙ্গু মঙ্গু দুজনেই নেই।

কি ভেবে আইভি দরজা খুলে ভিতরে ঢোকে, এদিক ওদিকে ছড়ানো ওদের জামা, গেঞ্জি, লুঙ্গি, ব্যাগ দুটো চারপাই-এর নীচে রাখা, ওপাশে কাঠের লম্বা টেবিলে বিছানার সৌখীন একটা চাদর, বেশ দামীই। ওদের সোয়েটারও দামী, চাদরটা তুলতে নীচে দেখে একটা সুন্দর ফাইল—এ্যালবাম-এর মত বই। একটা দামী পারকার পেন।

অবাক হয় আইভি। এত দামী পেন ওই চঙ্গু ব্যবহার করে তা ভাবেনি। ওদিকের এ্যালব্যামটা খুলে দেখে যত্ন করে গাছের পাতা—ফুল এসব রাখা, সুন্দর হাতে ওদের ল্যাতিন নামও লেখা, সংগ্রহের স্থান

সারান্দা অরণ্য আর তারিখ হাল ফিলের।

এ্যালবামের প্রথম পাতায় নামটা পড়ে আইভি। ডঃ রঞ্জন ব্যানার্জী, অধ্যাপক।

বটানির ডক্টরেট! আইভি চমকে ওঠে।

ওদিকে টেবিলের তলায় রাখা কিছু পাথর—ট্যাগ করা, ওপাশেও পাওয়া যায় চারপাই-এর নীচে একটা নোটবই।

ইনি অঞ্জন চ্যাটার্জি, জুয়োলজির অধ্যাপক।

ওরা এসেছে এই অরণ্য পর্বতে ওদের গবেষণার কাজে। আইভি খাতাপত্র যথাস্থানে ওই ভাবে রেখে বের হয়ে আসে।

একটা বিচিত্র রহস্যেরই যেন সন্ধান পায় সে। মনে হয়, চঙ্গু মঙ্গুর আসল পরিচয় সে জেনে গেছে।

উত্তেজনা চেপে আইভি বাংলোর এদিকে এসে একাই বসে থাকে। নিস্তব্ধ চারিদিক, দুপুরের রোদ ঢলে আসছে, বনে বনে গেরুয়া রোদের মিতালী। ঝোরার শব্দটা সমানে চলেছে, ওর মাঝে হঠাৎ একটা দেহাতী গানের সুর শুনে চাইল।

চঙ্গু ফিরছে কিছু শুকনো কাঠ কুটো নিয়ে।

অঞ্জন গেছে বসতির দিকে, যদি কিছু পেঁপে বা অন্য কোন ফল মেলে। কলা পেঁপে কিছু হয় ওদের ঘরে, পেয়ারাও মেলে অনেকের বাড়িতে। একা চঙ্গুই ফিরছে, বৈকালে চায়ের আগে না ফিরলে হৈ হৈ করবে সাহেব। রঞ্জনের মাথায় একটা গামছা জড়ানো, পরণে ধুতি ময়লা শার্ট, এরমধ্যে দেহাতী গানও শিখেছে।

—পুরবতর মালা—পছিতর মালা

জিয়া সুখ জিয়া ভরমাই।

হঠাৎ কাঠ রেখে নিজের খাপরার ঘরে ঢুকছে, পিছু পিছু আইভিকে আসতে দেখে বলে চঙ্গু।

—ক্যা মেমসাব! লড়াকি আনতে গেছলাম জঙ্গলে।

চা আভি বানায়েগা!

আইভি ঘরের মধ্যে ঢুকে বলে।

—কি নাম তোমার?

চঙ্গু! আজ্ঞে চন্দর মোহন।

—কে তুমি? ডঃ রঞ্জন ব্যানার্জি? না অঞ্জন চ্যাটার্জি?

চমকে ওঠে রঞ্জন। তবু বলে—কি বলছেন মেমসাব—আমি চঙ্গু আছি।

আইভি বলে—ধরা পড়ে গেছেন প্রফেসর ব্যানার্জি, বটানির ডক্টরেট হয়ে চঙ্গু নাম নিয়ে আর আমাকে ঠকাতে হবে না।

—মানে!

আইভি এবার চাদরের নীচেকার খাতা-কলম দেখিয়ে বলে।

এরপরও মিথ্যা বলবেন? এখন আপনার আসল পরিচয়টা যদি সর্বেশবাবু, মেজর জানতে পারেন?

রঞ্জন ভীতকণ্ঠে বলে—তাহলে মেজর সাহেব গুলি করে দেবেন। প্লিজ-দয়া করে ওসব বলবেন না কাউকে।

আইভি বলে—তাহলে আপনি ডঃ ব্যানার্জি, উনি অর্থাৎ মঙ্গু হচ্ছেন ডঃ চ্যাটার্জি। আপনি বটানি উনি জুয়োলজি?

মাথা নাড়ে রঞ্জন, বলে।

—চঙ্গু মঙ্গু সাজতে চাইনি, কিন্তু জানেন হঠাৎ বিপদে পড়ে গেলাম।

ওদের পথের সেই সর্বস্ব চুরির ব্যাপারটাই জানায় অকপটে আজ রঞ্জন। তারপর বনে আসার কাহিনী চঙ্গু মঙ্গু রূপে বহাল হওয়ার কথা জানায়, বলে রঞ্জন।

—ইচ্ছা করে এসব করিনি, ঘটে গেল। আর এখানে এসে দেখলাম অনেক কিছু ওই সর্বেশবাবু আদৌ সুবিধার লোক নন, উনি সবকিছুই লুট করতে চান তাও দেখছি।

আইভি শুনছে ওর কথাগুলো, বলে রঞ্জন।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না সর্বেশবাবু, বরং ওকেই বিপদে পড়তে না হয়।

আইভি দেখছে ওকে। রঞ্জন বলে।

—কিন্তু কথা দেন আমাদের ব্যাপারটা কাউকে জানাবেন না। প্লিজ, এতে আপনারও ভালো হবে।

আইভিকে সবই জানাল। বলে সে।

—ঠিক আছে কথা দিলাম।

—চঙ্গু। ইউ ব্লাডি শোয়াইন। হাঁক পাড়ে মেজর সাহেব।

আইভি বলে—যান, ওই শুরু হল। এরপর সর্বেশবাবুও এসে পড়বে। হ্যাঁ, ওইসব খাতাপত্র সামলে রাখবেন।

চঙ্গু ঘাড় নেড়ে ঘর বন্ধ করে দোঁড়াল জী সাব্।

নিমিষের মধ্যে সে পাক্কা রাঁধুনি সেজে গেছে, আইভি হাসছে।

আজ তার মনে কি যেন একটা সাহস জাগে।

বৈকাল নামছে, ঝোরার ধারে একটা শিমুল গাছে লাল ফুলের অরুনাভা, বাংলো থেকে বের হয়ে আসে আইভি, ওই জায়গাটা তার খুবই প্রিয়, পাথরে বসে ঝোরার জলধারার দিকে চেয়ে থাকে—ছোট ছোট মাছগুলো জলে দলবেঁধে খেলা করে, দু'একটা হরিণ ভীত ত্রস্ত কালো ডাগর চোখের চাহনি মেলে জল খেতে আসে। আইভি দেখে ওদের।

আজ তার মনে খুশির সুর জাগে। একা নয়, সে সর্বেশের লোভী হাত থেকে বাঁচবার জন্য আর একজনও তার পাশে আছে, যে রূপগুণে শিক্ষায়, সমাজের বরণীয় লোক। তারজন্যই যেন কোন রাজপুত্র ছদ্ম-বেশে রয়েছে তার পাশে।

গান গায় আইভি।

বেবী দেখে দিদির এই খুশিটা। আজ যেন দিদির গম্ভীর মুখে কি খুশির সাড়া ওঠে।

দিদি!

আইভি চাইল বেবীর দিকে। বেবী দেখছে ওকে।

কি ব্যাপার রে?

—আইভি জবাব দেয় না। ওর মনের সেই গোপন স্বপ্নটার কথা কাউকে জানাতে চায় না সে। বেবী উঠে আসে।

—চল, একটু ঘুরে আসি ওই গাঁয়ের দিক থেকে।

আইভি আজ বাধা দেয় না। এই সুন্দর উপত্যকাকে ক'দিন যে ভীত চাহনিতে দেখেছিল, আজ সেই ভয় কেটে গেছে। বলে সে?

চল!

ছোট্ট আদিবাসী বসতি। ঘরগুলো সুন্দর করে লালমাটি দিয়ে রং করা, দেওয়ালে ফুল—গাছ হাতি এসব আঁকা। একেবারে ঘরোয়া মেয়েদের এই অঙ্কন রীতি। তাতে একটা সহজ সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে নিজস্ব রীতিতে।

ওদিকে একটা চালাঘরে স্কুল বসেছে।

ছেলেমেয়েদের পড়ার শব্দ ওঠে। আর তার পাশে কিছু গাছগাছালি পেঁপে কলা পেয়ারা গাছে ফলও ধরে আছে প্রচুর।

ওখানে গাছের নীচে মঙ্গুকে দেখে বেবী বলে।

—দিদি, মঙ্গু না ? এ্যাই মঙ্গু !

আইভি ও দেখে মঙ্গুকে। ওর আসল পরিচয়টা আজ জেনেছে আইভি। সুন্দর ডাগর নিষ্পাপ চাহনি। মঙ্গুর পরণে মোটা ধুতি, ফতুয়া। হাতে একটা থলেতে কিছু আনাজ-পত্র।

মঙ্গু বলে—আনাজ-পত্র, কিছু ফলের জন্য এসেছি মেমসাব !

বহুৎ বড়িয়া আমরুদ আরও দাও জলদি। গাছের উপর থেকে হুঙ্কার ওঠে।

—এ্যাই বাচচালোগ জোরসে। তিন সাত একুশ ! তিন আট চব্বিশ, তিন নয় --

পেয়ারা, কলাগাছের মালিক ওই স্কুলের মাস্টার মশায়। গাছের ফল পাকুড় নগদে বিক্রী করার খদ্দের পেয়ে তিনি নিজেই গাছের ডালে উঠে বিক্রীর জন্য পেয়ারা পাড়ছেন আর গাছের ডাল থেকেই ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে নামতা হাঁকছেন—তিন নয়—সাতাশ !

লাফ দিয়ে এবার ডাল থেকে নেমে আসে পেয়ারার থলি নিয়ে। মাথায় টিকি—খালি গা। হাটু অবধি ধুতি।

এ হেন মাষ্টারকে দেখে বেবী হেসে ফেলে।

আইভি বলে—তবু এই বনের মধ্যেও লেখাপড়ার চর্চা তো রেখেছে তার দাম কি কম ?

মাষ্টার বলে—কোশিষ করতা মেমসাব। কিসি তরেসে গুজারা হোতা হ্যায়।

বৈকাল নামছে। ওরা ফিরছে বাংলোর দিকে। আজ আইভি দেখছে মঙ্গুকে। বলে সে—ব্যাগটা আমাকেই দাও।

মঙ্গু বলে—নেহি মেমসাব ! হাম হ্যায়, না !

বিজ্ঞ অফিসার হরলাল তেওয়ারী এবার রঞ্জনের দেওয়া কাগজপত্র-গুলো ওর কোয়ার্টারে বসে দেখছে। লোকটা যে বেশ ক্ষতি করেছে এই বনের, তা বুঝেছে হরলাল। এখনও বেশ কিছু লোককে হাতে এনে কাঠ পাচার করছে, হাতির দাঁতও পাচার করে মায় অন্য প্রাণীদের চামড়াও।

কিছু লোকের নামও পায়, হরলাল ওই সব কাগজে। গার্ড নটবরের

নামও রয়েছে। হরলাল তেওয়ারী এ সব ব্যাপার কাউকে জানতে দিতে চায় না। নজর রাখছে সে বনের যেখানে গাছ কাটাই হচ্ছে সেখানে।

বেশ কিছু দামী সেগুন কাঠ—রোজউড গাছও কাটা হয়ে গেছে। লগগুলো পিস করে একটু শুখুলেই ওদের পাচার করা হবে।

ভিখুয়াসর্দার এই বনের কোন আদিবাসী মুণ্ডাদের সর্দার। এককালে ওদেরই দখলে ছিল এইসব এলাকা। বনের রাজা ছিল ভিখুয়ার পূর্ব-পুরুষ। তাদের রাজধানীও ছিল—বনের মধ্যে। প্রজাদের সমবেত করার জন্য রাখা ছিল বিরাট একটা নাগরা; সেই নাগরা বাজিয়ে বিপদে আপদে বনের মানুষদের সমবেত করা হতো।

আজও অতীতের সেই রাজবংশের পরিচয় নিয়ে রয়ে গেছে বিশাল নাগরা। ওর গুরু গম্ভীর ধ্বনিতে বনের মানুষ বিপদের সঙ্কেত পেয়ে ছুটে এসেছে অতীতে।

আজ সে সব কাহিনীতেই পরিণত হয়েছে। তবু ভিখুয়াসর্দার বেঁচে আছে বনের অলিখিত রক্ষক হয়েই।

দেখে সে আজকালকার বনকর্মীদের লোভ আর অসাধুতা। বড় বড় গাছকে কেটে ফেলছে—রাতের অন্ধকারে পাচারও হয় সেইসব কাঠ। বললেও কেউ শোনে না।

এই প্রথম দেখছে ভিখুয়া সর্দার হরলাল তেওয়ারীকে—যে বনকে ভালোবাসে। বলে হরলাল।

—তোমার নাম শুনেছি সর্দার। এই বনকে বাঁচাতে চাই লোভী শয়তানদের হাত থেকে। তোমার মদত চাই। সর্দার দেখছে ওকে। বলে সর্দার।

—ওরা বিষ দিয়ে হাতিও মেরেছে—বাঘ, হায়না ভি মারে।

—সে কি!

হরলালকে ওই সর্দারই নিয়ে যায় বনের গভীরে।

ঘন বাঁশবনে ঢাকা পাহাড়—নীচে আটাড়ি লতাপলাশের ঘন জঙ্গল, সূর্যের আলোও সব সময় ঢোকে না।

সেখানেই দেখে হরলাল বিশাল হাতিটাকে। পড়ে আছে—ওর বড় বড় দাঁত দুটো নেই। সর্দার বলে।

—এবার কিছুদিন পর ওর হাড় ভি নিয়ে যাবে ওরা। হাতির হাড়ও ভালো দামে বিক্রী হয়।

ঘন বনের মধ্যে পড়ে আছে হাতির আধপচা মৃতদেহটা। অরণ্যের প্রাণীদেরও ওরা শেষ করবে। গাছগুলোকেও করছেই। হরলাল বুঝেছে এ কাদের কাজ। ধরতেই হবে তাদের।

সর্দার বলে—যদি সত্যি মদত চাস সাহেব—হ্যাঁ দিব।

লেকিন সত্যি কথা বলতে ভিখুয়া আজ ভুলে গেছে।

ভদ্রলোকেরা ওদের চিরকালই ঠকিয়েছে। তাই হরলালকেও অবিশ্বাস করে সর্দার।

হরলাল বলে—আমি চেষ্টা করবো সর্দার।

—হামি তোর সাথ দিব।

হরলাল বনের সব বের হবার পথে এমনি করে সজাগ প্রহরীর দল গড়ে তুলছে। নজর রাখতে হবে ওই—সর্বেশের উপরও। বনের বাইরে তাদের হেডকোয়ার্টারেও সব রিপোর্ট করবে হরলাল।

সর্বেশ এসব খবর জানে না। তার লোকজনদের নিয়ে সর্বেশ কাঠ পাচারের কাজ করে চলেছে। এর মধ্যে খবর আসে বেশ কিছু হাতির দাঁত – দুটো বাঘের চামড়াও মিলবে।

সর্বেশ তার ড্রাইভারকে দিয়ে লালজীকেও সেই খবরটা দেয়। কিছু টাকা আগাম পেলে ওসব মালও যাবে তার গুদামে।

সর্বেশ চোরাই দামী কাঠ, এইসব মালপত্র পাচার বরে বিশেষ উপায়ে। সাধারণতঃ সে বনের অফিস থেকে কাঠ কেনে, তার জন্য সরকারী পারমিট, চালান পায়।

প্রকাশ্যে সেই সব কাঠ ট্রাকে তুলে পারমিট দেখিয়ে বনের বাইরে এমন কি কলকাতা—অন্য শহরে চালান দিতে পারে। ওই আসল পারমিটটাকে সে বিশেষ চালানেও কাজে লাগায়। ওই পারমিটের মাল-এর নাম করেই কিছু পয়সা খরচ করে সে দু'নম্বরী কাঠ—ওইসব মালপত্র চালান করে দেয়। কখনও একেবারে জাল পারমিটও বানিয়ে নেয় কৌশলে।

হরলাল তেওয়ারী ওর সেই ধরণের মাল পাচারই হাতে নাতে ধরতে চায়।

সন্ধ্যার পর সেদিন বাংলোয় সর্বেশ, মেজর গাঙ্গুলি আহ্নিকে বসেছে। মদের বোতল ও হাজির। মিসেস গাঙ্গুলি এক পেগ নিয়ে মনটাকে রঙ্গীন করার চেষ্টা করছে।

কিচেনে রঞ্জন পকোঁড়া ভাজতে ব্যস্ত।

আইভিই বেসন গুলে দিয়েছে, প্লেটে সাজাচ্ছে। বলে আইভি।

—এসব কতদিন চলবে আর মিঃ চঙ্গু?

অঞ্জন বলে—তুমি তো রয়েছো।

—সাহেব যদি জানতে পারে সব ব্যাপারটা?

রঞ্জন বলে—একদিন জানবেই।

—তখন!

—সেই ঘটনার মোকাবিলা করার সাহস আমার আছে।

রঞ্জনের কথায় চাইল আইভি।

—সত্যি বলছেন?

রঞ্জন বলে—যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তাহলে—

কি আশা নিয়ে চাইল আইভি ওর দিকে।

এমন সময় একটা জিপের হেডলাইট এসে পড়ে সামনে--জিপটা থেমেছে বাংলোর সামনে। সর্বেশ দেখে স্বয়ং হরলালকে। খুশিই হয় সর্বেশ। তাহলে টোপ গিলবে ওই ব্যাটা রেঞ্জ অফিসার। সর্বেশ এগিয়ে যায়।

—আসুন, আসুন, ইনি মেজর গাঙ্গুলি। গাঙ্গুলিসাহেব, উনি রেঞ্জ অফিসার মিঃ তেওয়ারী, সজ্জন ব্যক্তি। ইনি মিসেস গাঙ্গুলি—

হরলাল দেখছে ওদের। বলে সে।

—এদিকে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম খোঁজ খবর নিয়ে যাই।

সর্বেশ বলে—অনেক ধন্যবাদ।

—তা কাজকর্ম কেমন চলছে?

সর্বেশ বলে—সব কাঠ এখনও চালান দিতে পারি নি।

হরলাল বলে—বর্ষার আগেই চালানের ব্যবস্থা করুন, নাহলে পথঘাট নষ্ট হয়ে যাবে। মালও আটকে যাবে বনের মধ্যে।

—তাই তো তাড়াতাড়ি পাঠাবার চেষ্টা করছি। একটু মদত করুন স্যার। এর মধ্যে সর্বেশ একটা গ্লাস এগিয়ে দেয়।

এসে পড়েছে রঞ্জন। মেজর গর্জে ওঠে।

—এ্যাই ব্লাডি চঙ্গু, জলদি সাহেবের জন্য পকোঁড়া লে আও।

চিকেন পকোঁড়া। নিন—

হরলাল দেখছে রঞ্জনকে। রঞ্জনও দেখছে হরলালকে। আজ ওরা

অতীতের বন্ধু হলেও কেউ কাউকে চেনে না। হরলাল বলে।

- ধন্যবাদ, মদ আমি খাই না। চিকেনও চলে না।

মেজর গাঙ্গুলি অবাক হয়।

—সেকি! অফিসার হয়ে মদ চলে না? ষ্ট্রেঞ্জ!

সর্বেশ বলে তাহলে সন্দেশ, ডালমুট?

—না? উঠে পড়ে হরলাল, বলে সে—সন্ধ্যাপুজো না করে জল খাই না। চলি।

সর্বেশ উঠে আসছে, আইভিও এসে পড়েছে ' দেখছে সে সর্বেশকে। সর্বেশ হরলালকে বলে।

—তাহলে কালই দেখা করবো স্যার, আপনি একটু দয়া করলে সব কাজই হয়ে যাবে আমার। নাহলে খুব বিপদে পড়বো স্যার, কাল কথা হবে।

সর্বেশ ভাবছে কাজ তার এগোবে এবার। হরলাল চলে গেল। সর্বেশ এবার খুশিমনে মদ্যপান করতে থাকে। ওদিকে আমদানীর ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাবে—তারপর আইভি, তাকেও হাতে আনবেই সর্বেশ।

আইভি সকালে বের হয়েছে বনের ওদিকে।

কাঠ আনতে গেছে রঞ্জনও। দুজনে চলেছে বনের মধ্যে। সকালের কুয়াশার জাল ভেদ করে সূর্য উঠছে—তার প্রথম আলো এসে পড়ে বনের বুকে, ফার্ণ গাছের চিরল পাতায় হিমকণাগুলো উজ্জ্বল কোমল হীরায় যেন পরিণত হয়েছে। জ্বলজ্বল করে।

দীঘল শালগাছগুলো কুমারী অরণ্যের ভিজে মাটির বুক থেকে ঊর্দ্ধাকাশে মাথা তুলেছে সবুজ পত্রাভরণ নিয়ে—অরণ্য নয়, যেন এক শুদ্ধ তীর্থ। প্রাণের স্পন্দন ভরা এক রূপরাজ্যে এসে পড়েছে ওরা।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আইভি ওই গাছগুলোর দিকে—ওরা যেন মাটির বুক থেকে প্রাণের স্পন্দন ধ্বনিত করেছে অরণ্যভূমিতে।

রঞ্জন বলে।

রবীন্দ্রনাথের বৃক্ষবন্দনা পড়েছো?

—মৃত্তিকার হে বীর সন্তান।
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকারে দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে;
…শ্যামলের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিলে অদম্য নিষ্ঠায়,

দুস্তর শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
বিজয় আখ্যান লিপি লিখে দিলে পল্লব অক্ষরে
ধূলিরে করিলে মুগ্ধ ;

এই অরণ্যভুমিই মানুষকে দিয়েছে বাঁচার আশ্বাস।

মাটিকে করেছে ফলবতী, মেঘ আসে বৃষ্টি নামে ফলবতী হয় মৃত্তিকা ?

ইন্দ্রের অপ্সরী আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
বাষ্পপাত্র চুর্ণ করি লীলানৃত্যে বরিষে বর্ষণ
যৌবন অমৃত রস—তুমি তাই নিলে ভরি ভরি
আপনার পত্র পুষ্পপুটে, অনন্তযৌবনা করি
সাজাইলে বসুন্ধরা।

আইভি শুনছে মুগ্ধ হয়ে ওর আবৃত্তি। এই বনষ্পতির মহিমাকে যেন নতুন করে অনুভব করে সে। বলে আইভি।

—এই অরণ্যকে মানুষ শেষ করতে চায় ? তাদের আমি ঘৃণা করি, সেই অমানুষ শয়তানের দলকে।

সর্বেশ বনের মধ্যে চলেছে, এদিকে কিছু দামী রোজউড গাছ আছে। তার লোকদের সন্ধান দিলেই হবে। ওই মাল পাচার করে দেবে তারা।

হঠাৎ দেখে বনের মধ্যে ওই চঙ্গু আর আইভিকে।

ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। একটা সাধারণ চাকর বাকরের সঙ্গে আইভি হেসে কথা বলছে ঘনিষ্ঠ হয়ে, চঙ্গুও যেন গদগদ হয়ে বোধহয় প্রেমই করছে।

সর্বেশ-এর সারা মনে আগুন জ্বলে ওঠে। সে ওই মেয়েটার জন্য এত খরচা করে ওই মেজর গাঙ্গুলির পরিবারকে পুষছে, আইভি তার সঙ্গে এভাবে কোনদিন হেসে কথা বলেনি, নিভৃতেও আসেনি। অথচ ওই ব্যাটা চঙ্গুর সঙ্গে এত ঘনিষ্টতা !

সর্বেশ কোনমতে নিজেকে সামলে সরে আসে। এবার সে ভালো কথায় না হলে জোর করেই আইভিকে দখল করে নিজের প্রতিষ্ঠা কায়েম করবে।

সর্বেশ এসেছে হরলালের কাছে। তার ব্যাপারটা পাকা করে ফেলতে চায়। হরলালও কাল রাতে গেছল বাংলোতে সর্বেশকে তেমনি একটা

আভাস দিতেই।

বেশ জানতো হরলাল সর্বেশই এসবের মূলে, তবু নিজে পরখ করতে চায়। আজ সকালে সর্বেশকে তার কোয়াটারে আসতে দেখে হরলাল যেন খুশিই হয়।

—আসুন সর্বেশজী। ব্যাচিলার্স ডেন—কি যে খাতির করি আপনার? চা-কফি?

সর্বেশ বলে—না না? ব্যস্ত হবেন না। তাহলে কাজের কথাটা সেরে ফেলা যাক।

হরলাল দেখছে ওকে। সর্বেশ যেন নিজের জালেই পা দিতে চলেছে। ব্যাগ থেকে একটা প্যাকেট বের করে।

—দশ হাজার আছে এতে।

হরলাল দেখছে ওকে। সর্বেশ বলে।

—আপাততঃ এটা রাখুন, আর ক'দিন একটু বনের দিকে রাতে যাতে আপনার লোকজন না যায় বলে দেবেন। চেকপোষ্টেও একটু বলে রাখবেন—আমি অবশ্য আরও দশ হাজার দেবো।

হরলাল কি ভাবছে।

ওকে সাবধান হতে দিলেই সর্বেশকে আর হাতে নাতে ধরা যাবে না। অথচ টাকা নিতে সে পারে না। কিন্তু এটা আপাততঃ তাকে মেনে নিতে হবে—সর্বেশকে জালে ফেলার জন্য।

হরলাল বলে—কি এত ভাবছেন স্যার। সামান্য কাজ তো—

হরলাল বলে—না। ঠিক আছে। তবে বাকী টাকাটা কলকাতায় গিয়েই নেব। কাজে লাগবে।

—বেশ তো! কলকাতার নাম ঠিকানা লিখে রাখছি খামের উপর, চলে আসুন।

নিজেই সর্বেশ ওই খামের উপর তার নাম ঠিকানা লিখে দেয়।

হরলালও খামটা নিয়ে অফিসের সিন্ধুকে পুরে তালাচাবি দিল। নিশ্চিন্ত হয় সর্বেশ। টাকায় কি না হয়, খুশি হয়ে বলে সর্বেশ—তাহলে চলি স্যার। আবার দেখা হবে, নমস্কার। হরলাল দেখছে ওকে। কে যে নাটের গুরু তা এবার জেনে গেছে সে, এবার শেষ আঘাতই হানবে ওই হরলাল। রঞ্জনকে দরকার—সর্বেশের গতিবিধির খবরটা জানাবে সেই-ই।

অঞ্জনও দেখেছে রঞ্জন আর আইভি'র সম্পর্কটা। দুজনে বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। অঞ্জনের এসব ভালো লাগে না। সেদিন দুপুরে কাজ-কর্মের পর দুজনে ঘরে রয়েছে। অঞ্জন বলে—রাঁধুনিগিরি করছিস কর আবার ওই আইভি'র সঙ্গে হুটহাট কোথায় যাস? দুজনে গানও গাইছিস শুনি বনে বনে।

রঞ্জন বলে—যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে বন্ধু। প্রেম করলে দোষ?

—তুই বাবুর্চি—

—বাবুর্চি যদি প্রেম করে দেখছিস তুই বেয়ারা হয়ে চুপ করে আছিস কেন? • বেবী তো রয়েছে—ঝুলে পড়।

অঞ্জন চমকে ওঠে—ওরে বাবা। যা বিচ্ছু মেয়ে। তবু আইভি শান্ত—ও!

হাসছে রঞ্জন। বলে—প্রেমে পড়লে ও শান্ত হয়ে যাবে।

জুতো সাফ করছিল অঞ্জন। ওটা তার ডিউটি। রঞ্জন বলে।

—ওর জুতোই তো দুহাতে জড়িয়ে আছিস। এবার নাহয় দেহি পদ পল্লব মুদারম বলে ঝুলে পড়।

অঞ্জন বলে—ইয়ার্কি থামা। নাটক যে ভাবে চলছে তাতে কোনদিন ফেঁসে না যাই। কলকাতা ছেড়েছি কতদিন, একটা চিঠিও দেওয়া হয়নি।

এবার রঞ্জনেরও খেয়াল হয় তাই তো! বাড়িতে ভাববে। মা বাবা জানে থলাকাবাদ বাংলোয় থাকবো, যদি ওরা বড়বিলে কাকাবাবুকে ফোন করে জানায় খবর নিতে—সর্বনাশ হবে।

অঞ্জন বলে—ওই রেঞ্জ অফিসার তোর চেনা, ওখানে একটা পোস্টকার্ডে খবর দে কলকাতায়, কাল হাটবার—কালই লোক বাইরে যাবে, তার হাতে চিঠি দিতে হবে।

কলকাতা থেকে দুই মূর্তি বের হয়েছে বেশ ক'দিন হয়ে গেল। দুই বন্ধুতে এমন যায় মাঝে মাঝে, কিন্তু যেখানেই যাক তারা বাড়িতে ঠিক মত চিঠিপত্র দিয়ে খবর পাঠায়।

সমরেশবাবুও ভেবেছিলেন রঞ্জনদের চিঠি আসবে দু'একদিনের মধ্যেই। কিন্তু দশ দিন প্রায় হতে চলল, কোন খবরই নাই ওদের। ললিতাও ছেলের জন্য ভাবছে এবার। স্বামীকে বলে—

—বনে পাহাড়ে অচেনা জায়গায় ছেলে দুটো গেল কোন খবর নাই।

একটু দ্যাখো !

সমরেশবাবু বলেন।

—অঞ্জনের বাড়িতে ফোন করো, দ্যাখো তারা কোন চিঠি পেয়েছে কি না ?

ফোন ও করা হলো। অঞ্জনের মা ফোন ধরে।

তার কণ্ঠেও উৎকণ্ঠার সুর ফুটে ওঠে। বলে সে।

—ললিতাদি এখানেও কোন চিঠি দেয়নি অঞ্জন। এবার দুটোরই বিয়ে থা'র ব্যবস্থা করো দিদি। আমার কথা তো শোনে না অঞ্জন। তোমাকে তবু মানে গণে—যেভাবে হোক বিয়ে থা দিয়ে ঘরবাসী করো দুটোকে।

ললিতা বলে ওসব হবে। এখন খবর পাই কি করে তাদের ?

সমরেশবাবু ও ভাবছেন কথাটা।

ওই বনের মধ্যে কোথায় কি ভাবে খবর পাবেন। তারপরই মনে পড়ে তার ভাই-এর কথা।

শমন দমন এখন ওই দিকেই থাকে। নামী লোক।

ললিতা বলে—ঠাকুরপোকেই ফোন করো, না হয় চিঠি দাও—ওর তো ওদিকে সব চেনা, ও নিশ্চয়ই খবর আনতে পারবে ওদের।

সমরেশবাবু তাই ফোনই করেন বড়বিলে ভাইকে।

কিন্তু খবর পান শমন দমন এখন দিল্লীতে রয়েছে। দু'তিন দিনের মধ্যেই ফিরবে। সমরেশবাবু ওর স্ত্রীকেই বলেন।

—বৌমা, রঞ্জন অঞ্জন ওদিকের থলাকবাদ ফরেস্ট বাংলোতে যাবে বলে বের হয়েছে। দশদিন হয়ে গেল কোন খবর পাইনি। দামু ফিরলেই ওকে বলো—ও যেন ওখানে গিয়ে ওদের খবর জানায় আমাদের। তেমন তেমন দেখলে ওদের যেন জঙ্গল থেকে বের করে আনে। খুবই ভাবছি আমরা।

মেসেজটা দিয়েই আপাততঃ অপেক্ষা করতে থাকে সমরেশবাবু, স্ত্রীকে বলে—দামু ফিরলেই খবর পাবে। ততদিনে ওদের কোন চিঠি আসে কিনা দেখ। কি যে করে ছেলেগুলো ?

অবশ্য রঞ্জন এখন এক নতুন স্বপ্নে বিভোর।

আইভি আর তার মধ্যে সম্পর্কটা সহজ ভাবেই গড়ে উঠেছে। সেটা এবার মিসেস গাঙ্গুলির চোখেও পড়ে।

মেজর গাঙ্গুলির এসব ছোটখাটো ব্যাপার দেখার সময় নাই।

সর্বেশ তার জন্য মদের যোগান ঠিকই রেখেছে। মেজর তাতেই খুশি।

সেদিন বেলা হয়ে গেছে, কিচেনে চঙ্গু নেই।

মঙ্গুই কোন মতে চা করে এনেছে। মিসেস গাঙ্গুলি বলে, চঙ্গু কোথায় ?

মঙ্গু জানে সে বের হয়েছে আইভি'র সঙ্গে। কিন্তু না জানার ভান করে বলে—বোধহয় ইয়ে কাঠ-এর সন্ধানে গেছে।

আইভিকেও পাওয়া যায় না।

সর্বেশ খুঁজছে তাকে। সেই-ই এসে বলে।

—হুটহাট করে যখন তখন বনে চলে যায় আইভি, মাসীমা ওকে সাবধান করে দিন—ডেঞ্জারাস বন। বাঘ হাতি সাপ ভালুক সব আছে। বনে একা যেন না যায়। ক'দিন রাতে বাঘের ডাকও শোনা গেছে বাংলো থেকে।

মিসেস গাঙ্গুলিরও ভয় হয় মেয়ের জন্য।

মিসেস গাঙ্গুলি বলে—আমি বলেছি বাবা, তবে শুনলাম চঙ্গু সঙ্গে গেছে।

সর্বেশ জ্বলে ওঠে—ওই ব্যাটাই হারামজাদা। ওর সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা কিসের ? প্রায়ই ওর সঙ্গে বনে যায়।

মিসেস গাঙ্গুলিও দেখেছে ব্যাপারটা, চাকরদের সঙ্গে একটু যেন বেশী মেলামেশা করছে আইভি। প্রায়ই দেখা যায় কারণ অকারণে বাংলো থেকে দূরে ওই কিচেনে ও সময় কাটায়। মিসেস গাঙ্গুলিও কথাটা আইভিকে বলবো বলবো ভেবেছিল, আজ সেই কথাটা সর্বেশকেও বলতে দেখে জানায় সে।

—আমি দেখেছি বাবা, মানে কাজের তদারক করতে যায় টায়। আজকালকার চাকরদের পিছনে না থাকলে কাজই করবে না।

সর্বেশ ভুলতে পারে না বনের মধ্যে আইভি আর চঙ্গুর সেই হাসি, ঘনিষ্টতার ছবিটা। তাই বেশ রাগত কণ্ঠে বলে—তাই বলে বেশী মাখামাখি আমি পছন্দ করি না। চাকরদের সঙ্গে এত মেলামেশা! আই হেট ইট।

মিসেস গাঙ্গুলি জানে সর্বেশকে কোন মতেই চটানো চলবে না। তাকে হাতে রাখতেই হবে। আর ওদের বিয়েটা হয়ে গেলে মিসেস গাঙ্গুলিও

পায়ের তলে শক্ত মাটি পাবে। তাই সর্বেশকে বলে মেয়ের হয়ে।

—আইভি ছেলে মানুষ। ওকে এবার থেকে তোমার মতেই চলতে হবে। তোমাদের দুজনের শুভকাজ শেষ হলে আমিও নিশ্চিন্ত। ঠিক আছে ওকে আমি বুঝিয়ে বলছি।

সর্বেশ সকালের জ্বালাটা এবার মিসেস গাঙ্গুলির উপর চালান করে, বলে সে—তাই বলুন।

বের হয়ে যায় সর্বেশ।

মিসেস গাঙ্গুলি বলেন—ব্রেকফাষ্ট করে যাবে না?

—কে দেবে! বাবুর্চি তো এখন বনভ্রমণে। ননসেন্স!

সর্বেশ বের হয়ে জিপে উঠে চলে গেল।

মেজর গিন্নী এবার গিয়ে কত্তাকে ধরে।

মেজরও দেখেছে সর্বেশকে বের হয়ে যেতে। স্ত্রীকে দেখে শুধোয়।

—সর্বেশ কোথায় গেল?

—কাজে। আর বেশ রেগে গেছে।

—কেন?

মেজর গিন্নী এবার বলে—চোখ নেই তোমার?

—আছে তো!

—ছাই আছে। মেয়ের কাণ্ড দেখতে পাও না! চাকর বাকরদের সঙ্গে এত ঘোরাঘুরি কেন?

চঙ্গুর সঙ্গে সকালে বনে বের হয়েছে। বনে কি নাই? হাতি বাঘ।

—তাইতো! না-না। আসুক আইভি আমিই নিষেধ করছি।

মেজর গিন্নী বলে—থাক। তুমি মদ গিলছ তাই গেলো? যা করার আমিই করছি।

মেজর সকালেই মদের বোতল নিয়ে খোয়াড়ি ভাঙতে বসেছে। গ্লাসটা গলায় ঢেলে বলে মেজর।

—তাই ভালো। তুমি না পারলে বলো—ব্যাটা চঙ্গু মঙ্গুকে আমিই—আই শ্যাল কিক্ দেম আউট!

লাথি মারতে গিয়ে নিজেই টাউরি খেয়ে সোফায় ছিটকে পড়ে মেজর।

চঙ্গু যথারীতি কাঠ-বসতি থেকে ডিম নিয়ে ফিরছে, আইভি'র হাতে একরাশ হলুদ বনচাঁপা, লাল গোলগোলি ফুল।

মুখে কি খুশির আভাস।

চঙ্গু চলে গেল কিচেনের দিকে, আইভি ঘরে ঢুকতে যাবে মায়ের ডাকে চাইল।

বেবী ওঘরে ছিল, ও সর্বেশদার রাগত স্বরের কথাগুলো, মায়ের কথাও শুনেছে। জানে বেবী দিদির খুশির খবর, কিন্তু খুশির কারণটা যে ওই চঙ্গু এটা মেনে নিতে পারে না সে। জানে বেবী তার দিদিকে। তার শিক্ষা, রুচি, সৌন্দর্যবোধ সবই জানে। তাই ওদের কথাগুলো ঠিক মেনে নিতে পারে না। তবু মাকে গম্ভীরভাবে দিদিকে ডাকতে দেখে বেবীও উঠে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

মেজর গিন্নী মেয়েকে বলে।

—সর্বেশ তোমার ব্যবহারে মোটেই খুশি নয়। তাছাড়া চাকর বাকর ওই চঙ্গু, ওর সঙ্গে বেশী মেলামেশা ভালো নয়। সর্বেশ যা পছন্দ করে না সেটা না করাই ভালো।

আইভি দেখছে মাকে। এতদিন ধরে আইভি সর্বেশের অনেক কিছুই সহ্য করে এসেছে। মনে মনে ওই লোভী লোকটাকে সে ঘৃণা করেছে, আজ তার আরও মনের জোর বেড়েছে। জানে ওই তরুণ ডঃ রঞ্জন চ্যাটার্জি তাকে সাহায্য করবেই। আইভি আজ ততটা অসহায় নয়। তাই মায়ের কথায় বলে।

—সর্বেশ বাবুর কেনা বাঁদী নই যে তিনি যা বলবেন তাই মুখ বুজে মেনে নিতে হবে। তোমাদের স্বার্থ থাকতে পারে—কিন্তু আমার কোন স্বার্থ নেই, তাই তাকে ভয়ও করি না।

মেজর গিন্নি বলে—দু'দিন পর তোর বিয়ে হবে ওর সঙ্গে।

ও! সব ব্যবস্থা করে ফেলেছো?

—হ্যাঁ, আমরা তাই চাই।

—আমি সেটা চাই কি না ভেবে দেখতে হবে।

—আইভি!

আইভি বলে—আমার মতামত না নিয়ে কোন কথা দিলে আমি তার জন্য দায়ী থাকবো না মা। তোমাদের নিজেদের স্বার্থে যা খুশি করবে সেটাই আমাকে মেনে নিতে হবে?

মেজর গিন্নী চমকে ওঠে, আইভি বলে।

—আমার পথ আমাকে দেখে নিতে দাও মা। তোমাদের মাথা না

ঘামালেও চলবে।

কথাগুলো বলে আইভি বের হয়ে নিজের ঘরে ঢুকলো। বেবী দেখছে ওকে, দিদি আজ স্পষ্ট ভাষাতেই মায়ের কথার প্রতিবাদ জানিয়েছে।

মেজর গিন্নী এবার ঘাবড়ে গিয়ে বলে মেজরকে।

—শুনলে মেয়ের কথা? বলে কিনা সর্বেশকে বিয়ে নাও করতে পারে। এত জোর ও পেল কোথা থেকে?

মেজর বলে—আহা ; এসব রাগ অনুরাগের ব্যাপার।

সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখবে অল কোয়ায়েট ইন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রণ্ট।

একমনে মদ্য পান করতে থাকে মেজর।

বেবী দেখছে আইভিকে।

আজ আইভিও বদলে গেছে, বলে বেবী।

--মায়ের দোষ নেই রে। তুই চঙ্গুর সঙ্গে বনে যাস—তাই সর্বেশদা রেগে গিয়ে মাকে কিসব বলেছিল।

আইভি বলে।

—কথাটা এবার ওই সর্বেশ শয়তানকেই জানিয়ে দেব মুখের উপর। ওই শয়তান বাবা মা-কে হাত করেছে—এবার আমার জীবনটাও নষ্ট করতে চায়, ও একটা শয়তান। ওকে মেনে নিতে পারবো না।

বেবী এগিয়ে আসে, সেও জানে ব্যাপারটা। বলে বেবী।

—আমিও তাই চাইরে দিদি, কিন্তু উপায় নেই।

বাবা মা ওর উপরই নির্ভর।

—তাই বলে আমাদের সর্বনাশ করবে? এ আমি হতে দেব না।

—পারবি দিদি?

আইভি আজ বোনকে কাছে টেনে নেয়, বলে।

—হ্যাঁরে, পথ একটা হবেই।

তারপরই বলে আইভি—হ্যারে মঙ্গু কেমন ছেলে?

চমকে ওঠে বেবী—ও তো বেয়ারা! ছাই পাঁশ কি বলছিস! চঙ্গু মঙ্গু! আইভি হাসে, বলে সে।

যেখানে দেখিবে ছাই
উড়াইয়া দেখ তাই,
পাইলে পাইতে পারো অমূল্য রতন।

দিদির দিকে চেয়ে থাকে বেবী বিস্মিত চাহনিতে।

চঙ্গু হাঁক পাড়ে—মেমসাব, ব্রেকফাস্ট রেডি।

আজ হাটবার, বনের গহনে শান্ত আদিবাসীদের বসতের সামনের বিশাল মাঠটা অন্যদিন জনশূন্য হয়ে পড়ে থাকে। ওদিকে টিলার গায়ে ফরেস্ট কলোনীর দু-চারটে বাড়ি—এদিকে আদিবাসীদের ছোট বসত। ওই মাঠে এখনও দু-চারটে সুপ্রাচীন বিশাল শাল মহুয়া গাছ রয়েছে।

ওই মাঠে আজ সকাল থেকেই শুরু হয়েছে বন বনান্তর থেকে লোকজনের আনাগোনা। মাঠের ওদিকে শালপাতার ছাউনি দেওয়া চালায় এর মধ্যে কোথা থেকে দোকনদাররা খচ্চরের পিঠে মাল এনে দোকান সাজিয়েছে।

একটা ট্রাক ও এসে থামে। উপচে পড়া ট্রাক থেকে বস্তা, টিন-জিনিষপত্র নামাচ্ছে দোকানীর দল। সস্তা ধুতি-শাড়ি-জামা-ফ্রক এসব নিয়েও এসেছে বহু হাটফেরতা কোন দোকানী। ওদিকে মনোহারী দোকানে পুঁতির মালা, কাঁচের চুড়ি—আয়না সস্তা তেল—ফিতে নানা কিছু মনোহারী জিনিষ সাজিয়ে বসেছে দোকানদাররা।

পানওয়ালাও বত্রিশ রকম হরেক রং-এর মশলাদার পানের পশরা এনেছে। ওপাশে বসেছে আনাজ নিয়ে অনেকে। হাট ওদের মিলনক্ষেত্র, সপ্তাহের দু'টা দিন ওরা এই দিনটির প্রতীক্ষা করে।

পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের বনপাহাড় থেকে আসে মানুষজন। খোঁজ খবর নেয় এ ওর। মা এসেছে পূব থেকে—মেয়ে থাকে পশ্চিমে, কতদিন পর মা মেয়েতে দেখা দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে।

এই হাটেই হয় ওদের মন দেওয়া নেওয়া।

কোন মেয়ে চেয়ে থাকে তার স্বপ্নের নাগরের দিকে—চোখে চোখে ইশারা হয়, দুজনে বনের গভীরে হারিয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য।

হাটের আকর্ষণে এরা আসবেই। ঘরের লাউ-কুমড়ো-কলার কাঁদি-যা হোক নিয়ে আসবে বিকিকিনির হাটে। আর এখানের প্রধান পশরা হাড়িয়া।

বড় বড় হাড়িতে ধেনো মদ নিয়ে ওরা সারবন্দী বসে গেছে, খদ্দেরও আসতে শুরু করেছে। বনের সবুজ শালপাতা পলাশপাতার তৈরী দোনায় আধাতরল সাদা ঘোলাটে ধেনো মদ নিয়েই বসেছে ওরা। বিকি কিনি শুরু হয়েছে।

হঠাৎ ওদিকে একটা জিপ এসে থামে, পথটা এসে থেমেছে টিলার নীচে। জিপ থেকে খাঁকি পোষাক পরা এক জাদরেল গোঁফওয়ালা সাহেব নেমে এদিকেই এগিয়ে আসছে।

পুলুশ !

তিনটি অক্ষর ওই পুলুশ অর্থাৎ পুলিশ-এর মাহাত্ম্য অনেক। ওই আদিবাসী মহলে ওই বস্তুটি খুবই আতঙ্কের। কথাটা হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। পুলিশ মানেই ঝামেলা. আর নিমেষের মধ্যে ওই মদের হাড়ির মালিকানা স্বত্ব পরিত্যাগ করে সারবন্দী মদের হাড়ি ফেলে বনের মধ্যে সেঁদিয়ে যায় মদের ব্যাপারীরা।

মাঠ প্রায় ফাঁকা; পড়ে আছে সারবন্দী বেওয়ারিশ হাড়িগুলো।

লোকজনও তটস্থ হয়ে ওঠে।

সর্বেশও আসছিল হাটে। তার লোকজনরা আজ আসবে—মালিকের পয়সায় হাড়িয়া গিলবে, মেয়েদের নিয়ে নাচগান হবে।

সর্বেশ ব্যাপারটা দেখে চাইল।

পুলিশ নয় বাংলো থেকে সেজেগুজে মিলিটারীর মত ধরাচুড়া পরে মেডেল্ ঝুলিয়ে আসছেন ফরোয়ার্ড মার্চ করে স্বয়ং মেজর সাহেবই।

আর ওকে দেখেই আবগারী পুলিশ ভেবে মদ ফেলে দৌড়চ্ছে ওরা। সর্বেশ বলে।

—ওরে, বল ওদের পুলিশ নয়—মদ ধরতে আসেনি।

সাহেব মদ টেষ্ট করতে এসেছেন, রসিক ব্যক্তি !

মেজর সাহেব বাতাসে মদের খোসবু পেয়ে এর মধ্যেই মেতে উঠেছে। ঘনঘন শ্বাস টানছে আর বলে।

—ফাইন। ভেরি গুড স্টাফ।

সর্বেশের কথায় স্থানীয় গ্রামবাসীদের ডাকে লোকজন আবার ফিরে আসে, হাড়িয়ার বাজার চালু হয়ে যায় যথারীতি।

মেজর সাহেবও একটা শালগাছের নীচে পাথরে বসে শালপাতার দোনায় সতেজ হাড়িয়া পর্ব শুরু করে।

বাংলো থেকে আইভি আর চঙ্গু বের হয়েছে।

আজ চঙ্গুর অনেক কাজ। হাটে আনাজ-পত্র মুরগী ডিম এসব কিনতে হবে। মেজর গিন্নী ফর্দ দিয়ে বলে—বাকী দোকানের জিনিষপত্র মঙ্গু

আনবে।

চন্দ্র বের হচ্ছে। আইভিও বের হয়ে আসে।

—হাটে যাবে তো?

মেজর গিন্নী বলেন—আইভি!

অর্থাৎ আইভিকে নিরস্ত করতে চায় সে।

কিন্তু আইভি মায়ের কথা কানে না তুলে বের হয়ে এল। পাকদণ্ডী দিয়ে নেমে চলেছে দুজনে, বনের আড়ালে আর ওদের দেখা যায় না।

রঞ্জন কালকের কথাগুলো শুনেছে, আজ সে একাই বের হয়ে আসছে হাটে। হরলাল-এর ওখানেও যেতে হবে, কিন্তু আইভিকে আসতে দেখে চাইল।

—তুমি! কাল মা কি সব বললেন।

আইভি বলে—ওসব কথা শোনার সময়, ইচ্ছা কোনটাই আমার নেই। তাই তোমার সঙ্গে চলে এলাম। অবশ্য তুমিও যদি ভয় পেয়ে থাকো তাহলে—

রঞ্জন দেখছে ওকে। শুধোয় সে।

—তাহলে!

আইভি বলে—দুঃখই পাবো। ভাববো একটা বিপদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে যাকে ভরসা করলাম সেও মানুষ নয়, ভদ্রবেশী অমানুষ। পথ খোঁজার চেষ্টা করবো, না পাই নিজেকে শেষই করে দেব, তবু তিলে তিলে জীবনভোর পুড়তে চাই না।

রঞ্জন বলে—তোমার দুঃখ আমি বুঝি আইভি। আজই তোমাকে নিয়ে এখান থেকে চলে যেতে পারি। দুজনে নিজেদের মত করে ঘর বাঁধবো কিন্তু—

আইভি বলে—কিন্তু?

—এখনও আসল কাজটা বাকী রয়ে গেছে। ওই শয়তানের মুখোশ খুলে ওকে চরম শাস্তি না দিয়ে গেলে একটা কৃত্য করা হবে না। তাই ক'দিন থাকতে হবে ওই সর্বেশের জন্য।

এগিয়ে চলেছে ওরা বনের পথে। আইভি বলে।

—ও কিন্তু সাংঘাতিক লোক। ওর দলবল আছে বড় ভয় হয় রঞ্জন।

রঞ্জন বলে—কোন ভয় নেই। আমিও একা নই, দেখবে ঠিক ব্যবস্থা হবেই ওর শিগ্‌গিরই।

হাটে তখন লোকজনের ভিড় শুরু হয়েছে। সর্বেশ দেখে আইভিকে। মঙ্গু তখন আনাজ-পত্রের দর করতে ব্যস্ত।

সর্বেশ বলে—চলো আইভি। হাট দেখবে চল। যা সুন্দর কাঁচের চুড়ি এসেছে।

মাদল বাঁশীর সুর শুরু হয়েছে ওদিকে। জানা নেই চেনা নেই মেয়ে পুরুষের দল মাঠে নাচের ছন্দে মেতে উঠেছে, একদল বসছে অন্য দল এসে যোগ দেয়। নাচ-গান সমানে চলছে। আর মেজর সাহেব জড়িত কণ্ঠে বাহবা দেয়—সাবাস। ভেরিগুড।

বাংলো ফাঁকা, বেবী একাই বসে আছে।

বাংলোর টিলা থেকে বনের ওদিকের মাঠে দেখা যায় হাটের লোকজন, দোকান বাজার, মাদল বাঁশীর সুর ওঠে। বেবী এখানে আজ নিঃসঙ্গ। দেখেছে বেবী, দিদিও আজ তার কাছ থেকে যেন দূরে তার নিজের জগতে সরে গেছে।

দিদির কথাগুলো মনে পড়ে। মঙ্গুর সম্বন্ধে তাই বেবী যেন নতুন করে ভাবছে। ওর চেহারাটা ও এবার ভালো করে দেখে, ভদ্র মার্জিত চেহারা।

ওর ওসব কাজ করার অভ্যাস নাই তা বুঝেছে বেবী।

মা ওকে বাজারের ফর্দ দিয়ে বলে।

—এগুলো ঠিক ঠাক নিয়ে আসবে, আর বেবী - তুই টাকা নিয়ে যা, মঙ্গু হিসাব পত্র বোঝে না, তুই হিসাব করে দাম দিবি।

মঙ্গু বলে—তাহলে তো খুব ভালো হয়, না হলে হিসাবে ঠকিয়ে নেবে মেমসাব। ওজনে ভি মারবে।

বেবী বের হয়েছে হাটের দিকে।

মঙ্গু চলেছে পিছু পিছু। পাহাড়ের গা বেয়ে ওরা নামছে।

সকালের রোদে পাথরের টুকরো গুলোর আলোয় ঝকমক করে।

বেবী একটা টুকরো কুড়িয়ে নেয়, বেশ ওজনে ভারি।

—এত ভারি পাথর?

বেবীর কথায় মঙ্গু বলে ওঠে।

—ওগুলো পাথরই নয়—আয়রণ ওর, খনিজ লোহা—ওতে আয়রণের ভাগ প্রায় ষাট পার্সেন্টের মত। বিশেষ করে গণ্ডোয়ানা রিজিয়নের এসব

পাহাড়ে আয়রণ ওর, ম্যাঙ্গানীজ-কোবাল্ট-ডালামাইট-সিলিকেট কি নেই, মাইকা—উলফ্রাম ও মেলে। ইট ইজ ভেরি রিচ ইন মিশরেলস্—

মঙ্গু ভুলে গেছে সে ডেইলি বিশ টাকা রোজের বেয়ারা। এই ভূ-তাত্ত্বিক খবর শুনেই তার ভিতরের সেই বিজ্ঞানী মন সব বাধা ঠেলে বের হয়ে পড়েছে। অঞ্জন বলে—এদিকে ডরমেন্ট ভলক্যানোও আছে—মানে নিভন্ত আগ্নেয়গিরি। এই গণ্ডোয়ানা—বিন্ধ্যাস রেঞ্জে তাই ব্যাসালস্' অর্থাৎ আগ্নেয়শিলাও প্রচুর মেলে।

বেবী দেখছে ওকে। ওর কথা শুনে সে অবাক। ওর উচ্চারণ—বাচন ভঙ্গী ও স্বতন্ত্র। দিদির কথা মনে পড়ে। চঙ্গুর সম্বন্ধে সঠিক খবর সে জানে না, কিন্তু বেবী এই মঙ্গুর সম্বন্ধে যা জেনেছে তাতে বেশ বুঝেছে যে মঙ্গু নিশ্চয়ই বেয়ারা নয়, অন্য কেউ, বেবী বলে ওঠে।

—গণ্ডোয়ানা রিজিয়ন, মিনারেল ডিপজিট—এসব তো বুঝলাম। কিন্তু তুমি কে? কি তোমার আসল নাম?

চমকে ওঠে মঙ্গু! আমতা আমতা করে।

—আজ্ঞে মেমসাব মঙ্গু! মদন মোহন—

—সাট আপ! মিছে কথা বলবে না। যা জিজ্ঞাসা করছি তার জবাব দাও। আসলে কি নাম তোমার? আর ওই চঙ্গুই বা কে? বেয়ারা তুমি নও। তাহলে জুয়োলজিক্যাল রিপোর্ট এভাবে দিতে পারতে না কলেজের লেকচার দেওয়ার মত করে! আমিও জুয়োলজির ছাত্রী আমার কাছে লুকোতে পারবে না।

মঙ্গু বলে—বিশ্বাস করুন।

বেবী বলে— তিনমিনিট সময় দিলাম, এর মধ্যে তোমার আসল পরিচয় যদি না দাও - আমি চীৎকার করে লোক ডাকবো - সবাই কে বলবো বনে তুমি আমার ইজ্জৎ নেবার চেষ্টা করেছিলে। তারপর জনতাই পিটিয়ে তোমাকে লাশ বানাবে।

আঁৎকে ওঠে অঞ্জন—ওরে বাবা, প্লিজ—এসব করবেন না। আমি তো আপনার কোন ক্ষতি করি নি ম্যাডাম। বেবী বলে— এক মিনিট হয়ে গেছে, আর দু'মিনিট। বলুন যদি ভালো চান—নাহলে এবার চীৎকার শুরু করবো।

আর্তকণ্ঠে বলে অঞ্জন, প্লিজ! শুনুন—

—শোনার কিছুই নেই। বলুন—

অঞ্জনের বাঁচার কোন পথ আর নেই। মেয়েটি যে এমনি সাংঘাতিক ধরণের তা ভাবতে পারেনি সে।

অঞ্জন বলে—বলছি, দয়া করে কাউকে বলবেন না।

—ঠিক আছে। বেবীও কথা দেয়।

অঞ্জন এবার নিজের পরিচয়টা জানাতে বাধ্য হয়। কি ভাবে এখানে এসে পড়েছিল। বেয়ারাগিরিতে বহাল হয়েছিল বন্ধুর কথায়, তাও জানায়। বেবী শুনছে ওর কথাগুলো।

দিদি তাহলে এমনি একটা ইঙ্গিতই দিয়েছিল। হাসছে বেবী—প্রফেসর থেকে বেয়ারা! তা মন্দ নয়। কিন্তু চঙ্গুটি কে? বলে ফেলুন স্যার—

না বলে উপায় আর নেই। অঞ্জন রঞ্জনের পরিচয়টাও দিয়ে ফেলে। বেবী বলে।

—দিদি বোধ হয় জেনেছে ওর পরিচয়?

অঞ্জন বলে—তা জানি না। তবে আপনি জানলেন প্লিজ কাউকে বলবেন না। এখন এখান থেকে চলে যেতে পারলে বাঁচি।

হাসছে বেবী।

—ভয় করছে স্যার?

—না। তবে জানাজানি হলে বিপদই হবে।

বেবী বলে—ভয় নেই, চলুন—হাটের দেরী হয়ে গেল। ওরা দেখতে না পেলে ভাববে।

অঞ্জন দেখছে বেবীকে।

বেবী এবার ধমকে ওঠে—এ্যাই মঙ্গু—জলদি চলো।

হাসছে অঞ্জন।

—হ্যাঁ, ওই নামটাই যেন বহাল থাকে। চলুন মেমসাহেব।

সর্বেশ জানে হাটে সকলকেই পাওয়া যাবে। কারণ বনের এই বসতগুলোর সব মানুষই এই একটা দিন যে যার কাজ ফেলে হাটে আসবেই।

খোলামনে কথা হবে, আর আড়ালে ব্যবসার কথা, লেনদেনও হবে।

সর্বেশের লোকজন দূর বনবসতের লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে, বনের গভীরে এখনও তারা ফাঁদ পেতে নিঃশব্দে হরিণ, সম্ভর ধরে, বাঘও ফাঁদ পেতে মারে। বন্যজন্তুগুলোর শিং, চামড়া অনেক দামে কেনে সর্বেশ। টাকাও ভালো পায় তারা, এছাড়া মাংস ও মেলে খাদ্য হিসাবে।

সুতরাং প্রায়ই এমনি কৌশলে শিং, চামড়া এসে জোটে সর্বেশের হাতে। দামী কাঠ তো আছেই। শিং, চামড়া মায় হাতির দাঁত ও পাচার করে সে।

আজ সর্বেশের লোকজন বেশ কিছু চামড়া—শিং মায় হাতির দাঁতের সন্ধান এনেছে।

হাটের ওদিকের মাঠে সারবন্দী মহুয়া—হাড়িয়ার হাড়ি নিয়ে মদ ওয়ালারা বসে গেছে, হাটের আসল পশরা ওইটাই।

রসিকজনের ও অভাব নেই।

সর্বেশ ওই আদিবাসীদের খুশি রাখার জন্য ঢালাও হাড়িয়ার অর্ডার দিয়েছে। ওরাও পান ভোজন শুরু করেছে, পকেটে সর্বেশের দেওয়া টাকাগুলোও রয়েছে।

সাহেবের দৌলতে তাদেরও আমদানী ভালোই হচ্ছে ওইসব বে-আইনী কাজ করে।

রঞ্জনও হাটে এসেছে। আইভি ওদিকে বেবীকে মঙ্গুর সঙ্গে আসতে দেখে এগিয়ে যায়।

—এসেছিস বেবী!

বেবী বলে—ওদের কাছে এই ঢের। চল ওদিকে নাচগান শুরু করেছে দেখা যাক।

বেবীও চলে গেল আইভি'র সঙ্গে।

অঞ্জন বলে আমি ততক্ষণ হাট পত্র সেরে নিই।

রঞ্জন লক্ষ্য রেখেছে ওই ভিড়ের মধ্যে সর্বেশের উপর। এত লোকজন থাকতে সর্বেশ বেছে বেছে কিছু লোককে ডেকে মদ খাওয়াচ্ছে, হাসি মশকরা করছে। নিজের পকেট থেকে ওদের মদ, মাংসের ঘুগনী খাওয়াচ্ছে।

রঞ্জন হাটের ভিড় থেকে এক ফাঁকে বের হয়ে চলে যায় ফরেস্ট অফিসের দিকে।

টিলার গায়ে ছড়ানো ছিটানো কলোনীটা।

হাটের দিন, তাদেরও আজ ছুটির আমেজ।

রঞ্জন এসে ফরেস্ট অফিসার মিঃ তেওয়ারীর বাসাতে ঢুকলো!

—আরে তুই! রঞ্জন।

তেওয়ারী এগিয়ে আসে বোস, চা বানাই।

রঞ্জন বলে—চা খাওয়ার সময় হবে না। সর্বেশবাবুও হাটে এসেছে। বেশকিছু লোকদের সঙ্গে বোধহয় ওর গোপন ব্যবসার কথাই হচ্ছে।

সর্বেশের নাম শুনে তেওয়ারী উঠে পড়ে।

—তাই নাকি! লোকগুলোকে চিনিস?

রঞ্জন বলে—ওর ড্রাইভার তার লোকজন ছাড়া অন্যরাও অনেকে রয়েছে। ওদের ঠিক চিনি না, তবে দেখে মনে হলো সুবিধের লোক নয়। দুনম্বরী কাজের লোকই সব।

তেওয়ারী বলে।

—তুই চলে যা হাটে, একসঙ্গে যাবো না। আমি পরে যাচ্ছি। দেখতে হবে ওই সর্বেশের স্যাঙ্গাতদের। মনে হয় এরপর বড় সড় কিছু করার মতলবে আছে ব্যাটা।

কলকাতা পুলিশ থেকে—আমার চেনা মহল থেকেও সর্বেশের সম্বন্ধে বেশ কিছু খবর আনিয়েছি। মনে হয়, সর্বেশ বড় কিছুর পিছনে রয়েছে, সেটা বন্ধ করতেই হবে।

ভিখুয়া সর্দারও এসেছে হাটে।

বুড়ো লোকটা হাটে এসে এদিক ওদিক ঘুরছে। ওপাশে একটা আমগাছের নীচে সর্বেশকে তার দলবল নিয়ে বসে মাল খেতে দেখে দাঁড়াল সে।

লোকগুলোর পেটে তখন তাজা মহুয়া পড়েছে, ফলে মনের আগল মুখের আগল সব দূর হয়ে গেছে।

সে বলে সর্বেশকে।

—ফিকির মাৎ করো সাহেব। হাতির দাঁত আরও দিব। আর ভাল দাম পেলে একেবারে রয়্যাল বেঙ্গলের চামড়াই দিব—

সর্বেশ বলে—পরে কথা হবে।

হাসে লোকটা—পরে কেনে? এখুনি বায়নার ট্যাকা দে—মাল তিনচার দিনের মাঝেই দিব, জবান।

কে বলে—সাব্ গত বারের এক পারমিট দেখিয়ে তিন ট্রাক মাল পাচার করেছি, পাঁচ হাজার ট্যাকা।

—দিব। এখন ওসব কথা থাক। সর্বেশ থামাবার চেষ্টা করে। লোকটার পৌরুষে বাধে—বলে সে।

—এত চাক ঢাক কেন রে সাহাব। ভূষনা মুণ্ডা বাপের ব্যাটা বটে, যা করে বুক ফুলাইন করে।

বুড়ো ভিখুয়া সর্দার শুনছে ওদের কথাগুলো, ওই শয়তানের দল টাকা আর মদের লোভে বনের, সারা দেশের মানুষের এমনি সর্বনাশ করে নিজেদের পেট ভরাচ্ছে।

—সাব্।

ভিখুয়া দেখেনি কখন তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তরুণ ফরেস্ট অফিসার হরলাল তেওয়ারী। তেওয়ারী ওকে ইশারায় চুপ করতে বলে সেও শুনছে ওই মদগর্বী মাতালদের কথাগুলো।

চমকে ওঠে তেওয়ারী। রঞ্জন ঠিকই বলেছে, ওই সর্বেশ টাকার জোরে এখানের বেশ কিছু লোককে প্রলুব্ধ করে তার নিজের মুনাফা বাড়াবার জন্য বনের এতবড় সর্বনাশ করে চলেছে সংগঠিত ভাবে।

আজ সেই বনের দু'চার জনের খবর পেয়েছে তেওয়ারী ওই রঞ্জনের জন্য।

একটা বিহিত করতেই হবে।

দরকার হয় তেওয়ারী হেড কোয়ার্টারেই সব জানিয়ে আরও কিছু ফোর্স, গাড়ি চাইবে।

ওই সর্বেশকে হাতে নাতে প্রমাণ শুদ্ধই ধরতে হবে। তাই ওর উপর নজর রাখতে হবে, সময়মত বা চরম ঘাই মারবে তেওয়ারী যাতে ওই সর্বেশ আর জাল কেটে বেরুতে না পারে।

তেওয়ারী সরে এল।

আর ভিখুয়া সর্দারও বুঝেছে ওই নতুন ফরেস্টের সাহেব কাজের লোক।

ভিখুয়ার বড় সাধ বন এমনি সবুজ হয়ে বেঁচে থাকুক। বনের মধ্যে নীচু একটা জায়গায় ভিখুয়া ঝর্ণার জলে বাঁধ দিয়ে বেশ গভীর জলাশয় তৈরী করেছে।

অবশ্য বেশী খাটতে হয়নি।

চারিদিকেই পাহাড়, ছোটবড় পাথর মাথা তুলে আছে সর্বত্র। ঝর্ণার জলটা ওই উপত্যকায় এমনিতেই জমে থাকে খানিকটা, বাকীটা পাথরের ফাঁক দিয়ে নীচের দিকে বয়ে যায়।

ভিখুয়া সর্দার তার যৌবনকালে বেশ কিছু ডুংরীর মেয়ে মরদকে

নিয়ে ওই পাথরগুলোর মাঝে মাটি ফেলে পথবন্ধ করে। উঁচু করে মাটি পড়ে পড়ে ওই বদ্ধ জল এখন পাহাড়ের বুকে সুন্দর জলাশয়ের রূপ নিয়েছে। ওই ফেলা মাটিকে সর্দার শাল, জারুল পিয়াসাল-কেঁদ পিয়াল নানা গাছ দিয়ে সাজিয়েছে। জল পেয়ে সেই গাছগুলো এখন বিশাল হয়ে উঠেছে।

তেওয়ারী এখানে এসে বনের মধ্যে ওই সুন্দর জলাশয়—তার ধারে দামী গাছ, গোলগোলি ল্যাণ্টার্ণা লতাপলাশ ফুলের সমারোহ দেখে মুগ্ধ হয়।

দেখে ওই জলাশয়ের ধারে ওই বুড়ো লোকটা কি করছে, বোধহয় মাছ ধরছে।

তেওয়ারী প্রথম এসেছে এই ফরেস্ট অফিসে পোষ্টিং পেয়ে।

—কি করছো এখানে ? মাছ ধরছ নাকি ?

ভিখুয়া সর্দার জল থেকে উঠে এসে বিনীত ভাবে নমস্কার করে বলে —না, হুজুর। বসতির কোন পুকুরে পদ্মফুলের গেঁড় কিছু পেয়েছি, ওগুলো ওই পুকুরে পুঁতছি। দেখবেন সারা পুকুর পদ্মবনে ছেয়ে যাবে, বহুৎ সুন্দর লাগবে স্যার।

তেওয়ারী দেখছে ভিখুয়াকে।

ক্রমশঃ তার পরিচয়ও জানে। ওর পূর্বপুরুষরা ছিল এককালে এই সব বনপাহাড়ের মালিক।

আজ সব গেছে, তবু বনের প্রতি মায়া, ভালোবাসা তাদের যায় নি।

ভিখুয়া বলে—এসব পেঁড় হামি লাগালো সাব।

বহুৎ কিমতী পেড়। মেহগিনি দেখুন ক্যামন সরেশ হয়েছে।

মেহগিণি, রোজউড উধার আসলি সেগুন।

জায়গাটা বনস্পতির ভিড়ে ভরে গেছে। ছায়াসবুজ এক উদ্যান গড়েছে লোকটা, বনকে সাজিয়ে রেখেছে।

আজ সেই ভিখুয়া সর্দারকে দেখে তেওয়ারী শুধোয়—খবর কি সর্দার ?

ভিখুয়া দেখেছে বনের উপর লুটেরাদের অত্যাচার। তার ভয় হয় তার নিজের হাতে লাগানো ওই গাছগুলোকেই না কোনদিন ওরা শেষ করে।

ভিখুয়া বলে—বহুৎ গড়বড় চলছে সাবু। বন মুলুক লুটেরার ভিড়ে ভরে গেছে।

তা বুঝেছে তেওয়ারী। ওই লোকটার সাহায্য তার দরকার। তাই বলে তেওয়ারী।

—একবার অফিসে এসো সর্দার। আজ সন্ধ্যাতেই এসো—জরুরী কথা আছে।

তেওয়ারী সাব্ গেল। সেও সর্বেশকে বুঝতে দিতে চায় না যে সে তার কাজের ব্যাপারে নজর রাখছে।

হাটের ভিড়ে মিশে যায় তেওয়ারী।

আদিবাসীদের ভিড় চারিদিকে। সভ্য জগতের ক'জন মানুষ যেন এখানে ওদের দেখবে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

আইভি এর মধ্যে কাঁচের চুড়ি কিনেছে—বেবী কিনেছে মাটির পুতুল। আর চঙ্গু মঙ্গুকে দেখা যায় ব্যাগ হাতে, কিছু শব্জী, পেঁপে—এসব কিনেছে। রঞ্জনের কাঁধে লম্বা মোটা ভীমের মিনি গদার সাইজে একটা লাউ।

তেওয়ারী দেখে ওদের।

কেউ কাউকে চেনে না। তেওয়ারী দেখছে ওদের নতুন রূপ।

বেবী বলে—কিছু পেয়ারা পাওয়া যাবে না? ওদিকে তো গাছ রয়েছে, পেয়ারা ধরেও আছে।

চঙ্গু বলে চলুন দেখি!

আচীর পাচীর নেই, টানা লম্বা ঘরটায় কাদের কলরব ওঠে। কাছে যেতে বোঝা যায় ওটা পাঠশালাই।

এই গহনবনের মধ্যেও শিক্ষার প্রসার অব্যাহত রয়েছে।

ছেলেমেয়েগুলো এদের দেখে নামতা পড়া থামায়।

আর সিটকে টিকিধারী লোকটা আদুড় গায়ে বের হয়ে আসে। পরণে ছোট্ট ধুতি।

চঙ্গু বলে—মাষ্টারজী, কিছু পেয়ারা যদি দিতেন—

মাষ্টারজী কিছু বলার আগেই ওদিক থেকে মোটকা মহিলা বের হয়ে এসে এদের দেখে দর হাঁকে।

—রুপেয়ামে আটঠো—

শেষ অবধি বারোটা করে রফা হতে মহিলা এবার মাষ্টারজীকে বলে।

—তোড় দে গিনকে!

মাষ্টারও কাপড় বাগিয়ে এবার পেয়ারা গাছে উঠে পেয়ারা পাড়ছে,

ছাত্র-ছাত্রীর দলও থেমে যায়। নামতা বন্ধ হতে ডাল থেকেই শীর্ণ মাষ্টার গর্জে ওঠে—এ্যাই, পড়ো। সাত তিন একুইশ, সাত চার আঠাইশ—মাষ্টারের পেয়ারা আহরণ আর শিক্ষাদান একসঙ্গেই চলতে থাকে গাছের ডাল থেকে।

এবার ফিরতে হবে বাংলোয়।

বেবী আইভিদের হাটপর্ব শেষ, রঞ্জন—অঞ্জনের হাতে ব্যাগ, কাঁধে লাউ ; এমন সময় আইভি'র খেয়াল হয় বাবা এসেছিলেন হাটে।

তাকে দেখা যাচ্ছে না।

হাটে তখন কেনাকাটার পালা শেষ। চলেছে হাড়িয়া উৎসব, আর এখান ওখানে মদ খেয়ে মাতাল ছেলে-মেয়েদের নাচগান চলছে।

সর্বেশের দেখা নেই। জিপটাও নাই।

সে কোথায় কোন ধান্দায় চলে গেছে। আইভি বলে।

—বাবাও কি ওর সঙ্গে গেছে ?

খুঁজছে ওরা। হঠাৎ দেখা যায় ওদিকে একটা শালগাছের নীচে কিছু ছেলে-মেয়েদের নাচগান চলছে, ওইখানে মেজর গাঙ্গুলি তখন বেটোর অবস্থায় নাচার চেষ্টা করছে—অত্যধিক মহুয়া সেবনের জন্য সোজা হয়ে দাঁড়াবার সাধ্য তার নেই।

লটকে পড়ছে—আবার কে তাকে ধরে তোলে।

মেজর সাহেব টলমল করে নাচার চেষ্টা করছে আবার, আবার ভূমি শয্যা নিচ্ছে।

হাসছে ওই আদিবাসী মাতালের দল। আইভি চমকে ওঠে।

—ননসেন্স, বাবার কাণ্ড দেখছিস বেবী ?

বেবীও দেখেছে ব্যাপারটা। বলে সে।

—এ ওই সর্বেশের কাজ।

আইভিও বুঝেছে সেটা। বলে সে।

—ওর জন্য মানসম্মান আর থাকবে না। লোকটাকে এখানে এনে মাতাল করে ফেলে রেখে চলে গেছে। ছিঃ ছিঃ !

মেজর গাঙ্গুলি তখন মহুয়াসুন্দরীর প্রেমে চগমগ।

আইভি বলে—ছিঃ ছিঃ তোমার লজ্জা করে না ? দিনের বেলায় মদ

গিলে হাটের মধ্যে মাতলামি করছো ? চল, বাংলোয় চল।

মেজর বিড় বিড় করে।

— হু আর ইউ ! বাংলোয় যাবো, হোয়াই ? এ্যাই মহুয়া দাও।

—না ! চলো তো।

আইভি বাবার হাতটা ধরে, বলে সে চঙ্গুকে।

—একটু হাত লাগাও, সাহেবকে নিয়ে যেতে হবে।

অঞ্জনের এমন বেহেড মাতালকে বহন করার অভিজ্ঞতা আগে ছিল না ; মাতাল সামলানো সত্যিই বেশ শক্ত কাজ, কখনও বসে পড়ে, কখনও ভূমিশয্যা নেয়।

আর কাঁধে ওই ব্যাগ, লাউ, সেই সঙ্গে ওই মাতাল।

ওরা ক'জনে কোনমতে মেজর সাহেবকে হাটতলা থেকে এনে বাংলোর নীচে ঝর্ণার জলে ফেলে আগপাশতলা জলে ডুবোতে সাহেবের হুঁস ফেরে।

পাঁঠা চুবোন দিয়ে সাহেবকে আনছে ওরা।

আর এবার মেজর সাহেব চঙ্গু মঙ্গুর উপরই ঝাল ঝাড়ে।

—আমাকে ইনসাল্ট করবে ইউ চঙ্গু, মঙ্গু, আমাকে জলে চুবোবে, আই শ্যাল স্যাক্ বোথ অব ইউ। নোকরীমে ভাগা দেগা · ইউ রাসকেল !

কোনমতে ওরা বাংলোয় ফেরে। মিসেস গাঙ্গুলিও দেখে ব্যাপারটা, তখনও সর্বেশের দেখা নেই।

এবার মালপত্র নামিয়ে চঙ্গু মঙ্গু বলে মিসেস গাঙ্গুলীকে।

—আর এ নোকরী করবো না মেমসাহেব। খাটবো খুটবো আর গালাগালি শুনতে হবে ? এসব পারবো না, আমাদের হিসাব চুকিয়ে দেন, চলে যাবো, আজই।

মিসেস গাঙ্গুলি প্রমাদ গণে। ছেলেদুটো চলে গেলে তারাই বিপদে পড়বে। তাছাড়া সর্বেশ নেই, ওদের টাকাকড়িই বা কে দেবে। টাকা পয়সা তো সব সর্বেশের হাতে।

তাই মেমসাহেব বলে।

—আমি সাহেবকে বলছি, এসব আর করবে না।

মিসেস গাঙ্গুলি মেজরকেই শাসায়।

—ফের ওদের সঙ্গে মাতলামি করলে, ওরা আর থাকবে না। ওই বাসনপত্র মাজা, রান্না সব তোমাকেই করতে হবে, বুঝেছো !

মেজর গাঙ্গুলিও বুঝেছে কাজটা ভালো করে নি।

ওরা চলে গেলে বিপদই হবে। তাই বেশ অপমানিত হয়েও কোনমতে বলে—আই অ্যাম সরি!

অর্থাৎ সাহেব দুঃখিত, রঞ্জন বলে।

—ঠিক আছে, আপাততঃ রইলাম।

বেশ জানে রঞ্জন এত সহজে তাদের এখান থেকে চলে যাওয়া হবে না। ফরেস্ট অফিসার তেওয়ারীও বলেছে—ক'দিন মদত দিতে হবে।

তাই থাকতে হবে রঞ্জনকে। আরও একটা কারণ আছে—সেটা ওই আইভি।

আজ রঞ্জন বুঝেছে ওই সর্বেশের মত একটা অমানুষ শুধু অরণ্যকে লুণ্ঠন করতেই এখানে আসে নি, ওই আইভি আর বেবীর মত পবিত্র দুটো মেয়েরও সব নাশ করতে চায়।

মেজর গাঙ্গুলি একটা অপদার্থ মানুষ, নিজের সামান্য পাওয়ার জন্য সে তার মেয়েদেরও বিকিয়ে দিতে পারে। আর মিসেস গাঙ্গুলি ভাবছে সর্বেশ সুপাত্র। যদি মেয়েকে বিয়ে করে সে কন্যাদায় থেকে মুক্ত হবে, আর তার সংসারের ভাবনা থেকেও মুক্তি পাবে মিসেস গাঙ্গুলি।

বেলা হয়ে গেছে।

চঙ্গু কিচেনে ব্যস্ত। মঙ্গু যথারীতি পাম্প করে জল তুলছে ওদিকে। আইভি এসে ঢোকে কিচেনে।

আনাজপত্র কাটছে অঞ্জন ভাত ডাল চাপিয়ে।

আইভি বলে—চলে যাচ্ছিলেন যে?

চাইল রঞ্জন। আইভি জেনেছে রঞ্জনের আসল পরিচয়টা।

বলে আইভি।

—অবশ্য এসব কাজ করা অভ্যাস তো নেই। অনেক করেছেন আমাদের জন্য, তা কিন্তু দেখছেন তো অবস্থাটা, আমার যে কি হবে তা জানি না।

আইভি আজ নিজের বিপদের গুরুত্বটা বুঝেছে।

বলে আইভি—আমার যা হয় হোক। আপনাকে বাধা দেবার কোন অধিকারই নেই। নিজের জন্য আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না। যদি যেতেই চান, বাধা দেব না।

চাইল রঞ্জন। আজ আইভি'র চোখের জল তার মনে কি এক ব্যাকুলতা আনে। বলে রঞ্জন।

—তোমাকে এই বিপদের মধ্যে ফেলে কাপুরুষের মত নিজে পালিয়ে যাব না আইভি। এই সমস্যার সমাধান নিশ্চয়ই করতে পারবো। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে।

আইভি ওর কথায় যেন আজ সাহস খুঁজে পায়।

—সত্যি বলছ রঞ্জন?

রঞ্জন আজ আইভিকে কাছে টেনে নিয়ে বলে।

—হ্যাঁ আইভি, তোমার কোন ক্ষতি হতে দেব না।

বেবী ঢুকছিল কিচেনে।

হঠাৎ দরজার কাছে এসে রঞ্জন আর আইভি'র কথা শুনে থমকে দাঁড়ায়। আজ সেও বুঝেছে দিদি ওই রঞ্জনের উপর আজ কি নির্ভর খুঁজে পেয়েছে। বেশ বুঝেছে আইভি—রঞ্জনই পারে তাকে নতুন পথের নির্দেশ দিতে।

তাই সেও আজ শান্তি পেয়েছে।

বেবী সেই ভালোবাসার স্বাদ এ জীবনে পায়নি।

ওই ভালবাসা যে মনকে অনেক জোর এনে দিতে পারে এটা ছিল তার অজানাই।

এতদিন ধরে সে যে জগৎকে চিনেছে সেখানে বেবী ছিল একাই। আজ দিদির ওই নতুন পাওয়া ঐশ্বর্যকে সে হিংসা করে। তার মনে হয় সেও একজনকে পাশে পেতে চায় যে তাকে অনুপ্রাণিত করবে।

সর্বেশকে এতদিন দেখেছে বেবী।

মনে হয়েছে ও যেন একটা লোভী মানুষ। নিজের নিয়েই ব্যস্ত। নিজেই পাবার জন্যই সে সবকিছু করে।

মদ খায় রাতে, আর হৈ হল্লা করে।

দিদির দিকে ওর লোভী হাতটা যেন বাড়ানোই রয়েছে।

তার তুলনায় আজ ওই রঞ্জনবাবু, অঞ্জনকে দেখে মনে হয় ওরা একেবারে স্বতন্ত্র ধরণের মানুষ। আজ অযাচিতভাবে দিদির চরম বিপদের দিনে রঞ্জনবাবু তার পাশে দাঁড়িয়েছে।

আর সেই যোগ্যতা তাদের আছে।

বেবীর মনে হয় অঞ্জনের কথা। ছেলেটা কেমন নিরীহ, ভীতু। ওকে

ভালো লাগে বেবীর।

পায়ে পায়ে সরে এল বেবী। রঞ্জন আর আইভিকে বাধা দিল না।

ঘামছে অঞ্জন। পাম্পটা থামিয়ে দম নিচ্ছে। হঠাৎ বেবীকে আসতে দেখে চাইল সে। বেবী বলে।

—কি হল স্যার! হাত ব্যথা করছে?

—না না!

বেবী বলে—আপনি বসুন। আমি দেখছি।

বেবী গাছকোমর করে নিজেই পাম্পটা চালাতে থাকে। পাম্পের তালে তালে ওর সুঠাম দেহটা আন্দোলিত হচ্ছে, ফর্সা গাল ক্রমশঃ লালচে হয়ে আসে।

অঞ্জন বলে—ছাড়ো। আমি দেখছি।

বেবী বলে—আমাদের জন্য কত কষ্ট করছেন তাই দেখছি।

অঞ্জন বলে—কেন আপত্তি আছে?

বেবী শোনায়—আমার কথার দাম কি বলুন? তবে খারাপ লাগছে, আপনারা দুজনে যা করছেন।

অঞ্জন বলে—এসবও না হয় একটু অভ্যাস করলাম। রঞ্জনও তো করছে।

বেবী বলে—প্রেমে পড়লে ছেলেরা অনেক কিছুই করে।

—মানে? অবাক হয় অঞ্জন।

হাসছে বেবী। বলে সে—রঞ্জনবাবু দিদির প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

চমকে ওঠে অঞ্জন—কি বলছেন?

—ঠিকই বলছি। তবে আপনি প্রেমে পড়েন নি তা বুঝেছি।

হাসে অঞ্জন। বলে সে।

—প্রেম ট্রেম আমি মানি না।

—শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। অর্থাৎ দিদি যে বিপদে পড়েছে আমি তেমন বিপদে পড়বো না।

অঞ্জন শুধায়—বিপদ!

—নয় তো কি! একদিকে সর্বেশবাবু দিদির জন্যে হা পিত্যেশ করে বসে আছে। এখানে এসেছে দিদিকে জমিয়ে প্রেম-ট্রেম করার জন্য। এদিকে দিদি পড়ে গেছে রঞ্জনদার প্রেমে। শেষে সর্বেশ বনাম রঞ্জন একটা টক্কর না বেধে যায়।

অঞ্জন ঘাবড়ে গেছে—তাই নাকি !

—তাই তো মনে হচ্ছে ।

পাম্পটা টানছে বেবী ।

মেজর গাঙ্গুলির নেশাটা ছুটে গেছে ।

বেশ গোলাবী নেশা জমেছিল । কিন্তু ওই চঙ্গু আর মঙ্গু দুটোতে মিলে ঝর্ণার হিমজলে কোট প্যাণ্ট সমেত তাকে চুবিয়ে এমন জমাটি নেশাটাই বরবাদ করে দিয়েছে ।

মেজর সাহেবের মেজাজটা তাই বিগড়ে গেছে ।

একটু মদের দরকার । ঘরেও মদ নাই, যা আছে গিন্নীর কাছে । তাই ওই চঙ্গু, মঙ্গুকে দিয়েই আনাতে হবে ।

মেজর সাহেব দেখে গিন্নী ওদিকে উল বোনায় ব্যস্ত । দিনরাত বুনেই চলেছে মাকড়সার মত । মেজর সাহেব এবার বের হয়ে কিচেনের দিকে চলেছে । যদি চঙ্গু মঙ্গুকে পাওয়া যায় ।

চারিদিক শুনশান ।

দু'একটা পাখী ডাকছে, ঝোরার সেই শব্দটা বেজে চলেছে । পাম্পটা ঘটর খটর করে চালাচ্ছে কে ?

ওদিকে নজর পড়তে অবাক হয় মেজর । ওই মঙ্গু গাছতলার ছায়ায় বসে আছে আর পাম্প চালাচ্ছে বেবী ।

চাকরটার সঙ্গে বেশ হেসে গল্প করছে বেবী, আর ওর কাজ সেইই করে চলেছে । কেমন ভালো লাগে না মেজরের তার মেয়ের চাকরের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠতা ।

এখন মদের দরকার । এই টিলা থেকে রাস্তার ওপারে হাটের মাঠে দেখা যায় হাড়িয়াওয়ালারা এখনও বিকিকিনি চালিয়ে যাচ্ছে ।

চঙ্গু ছেলেটা বেশ হিসেবী, তাকেই পাঠাতে পারলে গোপনে কিছু মদ আনতে পারবে । তাই কিচেনের দিকেই চলেছে মেজর ।

রঞ্জন এমনিতে সাবধানী । সে নজর রেখেছে বাইরের দিকে । দেখছে পাম্প-এর কাছে অঞ্জন-বেবীর ওই নাটকটা ।

এদিকে আইভি আজ তার মনের সব দ্বিধা ভুলে তার দিকে এগিয়ে এসেছে ।

আইভি ওদিকে রান্নায় ব্যস্ত । হঠাৎ চঙ্গু মেজরকে এদিকে আসতে

দেখে নিমেষের মধ্যে বদলে যায়।

বসে সে গলা তুলে—এত কম মাইনেতে এত কাজ করতে পারবো না মেমসাহেব। মাইনে বাড়াতে হবে।

আইভি হাসছে।

ইশারায় জানায় রঞ্জন মেজর সাহেব এদিকে আসছে। আইভিও নিজেকে বাঁচাবার জন্য বেশ গলা তুলে শোনায়—আমাকে নোকরী ছেড়ে যাবার ভয় দেখিও না! মাইনে বাড়াতে হয় সাহেবদের বলো, আমার কাজ চাই। জলদি লাঞ্চ রেডি করো। ইউ চঙ্গু, নো হেঙ্কিপেঙ্কি বিজনেস।

একেবারে মালকিনের ভূমিকায় নিখুঁত অভিনয় করে চলেছে আইভি। আর বেচারা চঙ্গু কাই মাই করে।

মেজর সাহেবও খুশি হয়েছে আইভি'র এই শাসনে। কিচেনে ঢুকে মেজর বলে।

—রাইটলি সর্ভড। কাজের বেলায় নেই শুধু মাইনে বাড়াও। ইউ ব্লাডি ফুল। সর্বেশ আসুক, তোমাদের কোর্ট মার্শাল করবো। বোথ অব ইউ—একটা চোর, অন্যটা ফাঁকিবাজ।

মদের কথা ভুলে গেছে মেজর। এবার মিলিটারী মেজাজই ফুটে উঠেছে।

কিচেনে গোলমাল শুনে মিসেস গাঙ্গুলিও এসে হাজির হয়েছে, এসে পড়েছে বেবীও। দেখে সে দিদির ওই শাসন। মিসেস গাঙ্গুলিই বলে।

—তোমরা বাবা-মেয়েতে যা মেজাজ দেখাতে শুরু করেছো, বেচারা দুটোকে তিষ্ঠোতে দেবে না? থামো তো!

মা-বাপ থামলো। মিসেস গাঙ্গুলি বুঝেছে ছেলে দুটো ক'দিন হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করছে হাতে একটা পয়সাও পায় নি।

বলে সে—চঙ্গু, মঙ্গু কিছু মনে করো না। ছোট সাহেব ফিরলেই আজ তোমাদের ওই সপ্তাহের পেমেণ্ট করে দেব। যাও, ঠিকমত কাজ করো। চলো তো—

মেজর গাঙ্গুলি আর আইভিকে নিয়ে বের হয়ে এল কিচেন থেকে মিসেস গাঙ্গুলি। মেজর এতক্ষণে বোঝে তার আসল কাজটাই হয় নি। মদ আনাবে, তা হল না।

বলে মেজর মেয়েকে।

—ঠিক করেছিস, চাকর-বাকরদের লাই দিতে নাই। আসুক সর্বেশ, ওই বেয়ারা দুটোকেই সিধে করে দেবে।

গলা নামিয়ে মেজর এবার বলে আইভিকে।

—তোর কাছে পাঁচ দশ টাকা খুচরো আছে?

—কেন? বলল আইভি।

মেজর বলে—ইয়ে একটু দরকার ছিল।

আইভি পাঁচ টাকার নোট একখানা বের করে দিতে মেজর সেটা নিয়ে এবার হন হন করে পাকদণ্ডী বেয়ে নামতে থাকে।

—কোথায় চললে?

আইভি'র কথার জবাব দেবার সময়ও তার নাই। হাটে মহুয়ার শেষ বিকিকিনি তখনও চলছে। মেজর হন্ হন্ করে সেইদিকে চলে গেল।

সর্বেশ জানে কখন কোন কাজ করতে হয়। এই বনে এসে সর্বেশ যোগাযোগগুলো বেশ ভালোভাবেই গড়ে তুলেছে। সব দেশেই—সব জায়গাতেই অসৎ অসাধু মানুষ রয়ে গেছে। তারা যেন সব এক জাত, একই গোত্রের। তাই তাদের এক হতে দেরী হয় না।

পরস্পর পরস্পরকে চিনে নিতে পারে সহজেই। সর্বেশ এই বন আর বনের বাইরের এইসব কাজের লোকদের সঙ্গে আঁতাত গড়ে তুলে এর মধ্যে বেশ কিছু বাণিজ্য করেছে। দামী লগও বের করেছে জাল পারমিটের বলে কয়েক ট্রাক, আর হাতির দাঁত, বাঘের চামড়াও বেশ পাচার করে তার সাহস এখন বেড়ে গেছে।

তাই এবার সর্বেশ আরও বেপরোয়া হয়ে বেশ কিছু দামী লগ, আর বনের বিভিন্ন কোণ থেকে সংগৃহীত বেশ কিছু হাতির দাঁত, বাঘের চামড়া, হরিণ সম্বরের চামড়া, সিং এসবও যোগাড় করে এবার ট্রাক বোঝাই করে পাচারের ব্যবস্থা করছে।

ওই সর্বেশ জানে না যে তার পিছনে বেশ কয়েকজোড়া সাবধানী চোখ নজর রেখেছে। ভিখুয়া সর্দার তাদের অন্যতম।

সে এখন পেটের দায়ে বন ঠিকাদারের গুদামে কাজ করে। আর সর্বেশকেও দেখে এখানে এই বনের মধ্যে পাতার অস্থায়ী ডেরায় প্রায় আসতে।

ঠিকাদার নওলকিশোরও রসিক ব্যক্তি। আর নানা ধান্দা তার।

সর্বেশকে সে মদ খাওয়ায় আর অস্থায়ী বসতের চালু মেয়ে গিরিও সেই আসরে হাজির থাকে।

ওখানেই টাকার লেনদেন হয়। বেশ দামী কাঠগুলো ওদিকের বনে পাতা চাপা দেওয়া পড়ে থাকে, আর রাতের অন্ধকারে আসে লোকজন হাতির দাঁত, চামড়া এসব নিয়ে।

সর্বেশ বেশ কিছু টাকাও দেয় তাদের।

আরও মাল চাই। দরকার হয় বিষ দিয়ে বনের প্রাণীদের শেষ করে করে নিঃশব্দে ওরা এসব সংগ্রহ করে। গুলিগোলা চালালে শব্দ হবে। তাই এই কৌশলেই তারা বাঘ অবধি মারছে।

ওদের মদের ফোয়ারা চলে, টাকা আসছে অনেক। তার থেকে কিছুটা ফুর্তির জন্য খরচা হয় হোক। কাজ পাওয়া যাবে।

ভিখুয়া সর্দার সবই দেখে রাতের অন্ধকারে। আর সেই খবরগুলো এনে পৌঁছে দেয় ফরেস্ট অফিসার ভোলা তেওয়ারীর এখানে।

সেদিন দুপুরে এসেছে রঞ্জন ভোলা তেওয়ারীর ওখানে। ফরেষ্ট অফিসার তেওয়ারী বলে।

—তোর ওই সর্বেশ তো বেশ জমিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে শুনলি তো!

রঞ্জনও শুনেছে ওই খবরগুলো। এখন সর্বেশ বেপরোয়া হয়ে বনের সর্বনাশ শুরু করেছে। রঞ্জন বলে।

—ব্যাটাকে এবার এ্যারেষ্ট কর।

মি. তেওয়ারী বলে—হাতেনাতে মাল সমেত ধরতে হবে, নাহলে ওরও টাকার জোর আছে, এখানেও লোকজন আছে। কোন সাক্ষী প্রমাণ মিলবে না। ছাড়া পেয়ে যাবে। ওকে সেই সুযোগ দিতে চাই না। একেবারে মালসমেত ধরতে হবে। তার জন্য সুযোগ খুঁজছি।

রঞ্জনও বোঝে কথাটার গুরুত্ব। বলে সে।

—তাই ভালো।

মিঃ তেওয়ারী বলে—তত্দিন থেকে যা তুইও ওখানে। নজরদারির সুবিধা হবে। কলেজ তো খোলার দেরী আছে?

—তা আছে, কিন্তু—

হাসছে মিঃ তেওয়ারী রঞ্জনের কথায়। বলে তেওয়ারী।

এত কিন্তু টিন্তু কেন বাবা—যেতে তুমি পারবে না তা বুঝেছি রঞ্জন!

—মানে ?

মিঃ তেওয়ারী শোনায়।

—মানে খুবই পরিষ্কার। ওই মিস্ গাঙ্গুলির সঙ্গে তো দেখি বেশ জমেছিস !

—না-না ! মানে—

রঞ্জনের কথায় তেওয়ারী বলে।

—এত লজ্জার কিছুই নেই ব্রাদার। মেয়েটাকে যদি উদ্ধার করতে পারো ওই সর্বেশের মত একটা ক্রিমিন্যালের হাত থেকে - সেটা একটা কাজের কাজই হবে। কারণ সর্বেশ একদিন না একদিন জালে পড়বেই, সেদিন ওর জেল, কেউ আটকাতে পারবে না।

কথাটা ভাবছে রঞ্জনও।

সর্বেশকে সেইই ধরিয়ে দেবে, এ তারই কর্তব্য। তাই আইভি'র প্রতিও তার কিছুটা কর্তব্য রয়ে গেছে।

ফিরছে রঞ্জন আদিবাসী বসতি থেকে।

দুপুরের ক্লান্ত রোদ আলোছায়ার আভাষ এসেছে বনভূমিতে। হঠাৎ বনের মধ্যে ঝর্ণার ধারে রঞ্জন অঞ্জন আর বেবীকে দেখে চাইল।

বেবী একমনে পাথরের টুকরো কুড়িয়ে চলেছে—আর সেগুলো এনে হাজির করে অঞ্জনের সামনে। অঞ্জন সেগুলো থেকে কিছু পাথর বেছে নিয়ে বেবীকে সেই স্টোন ফর্মেশন, স্টোনের গুণগত মান এসব সম্বন্ধে লেকচার দিয়ে সেগুলো ঝুলিতে পুরছে।

বেবী ওর পাশেই বসেছিল, অঞ্জন নিবিষ্টভাবে ওকে কি বোঝাচ্ছে, হঠাৎ শুকনো পাতায় কিসের শব্দ শুনে বেবী আতঙ্কে চীৎকার করে অঞ্জনকে জড়িয়ে ধরে। অঞ্জনও ওর পুরুষ্ট যৌবনমাতাল দেহের নিবিড় ছোঁয়ায় কেমন বিভ্রান্ত হয়ে যায়।

এ যেন তার জীবনে এক বিচিত্র অনুভূতি। ঝড় ওঠে সারা মনে।

কিছু নয়। একটা কটরা হরিণ নির্জনে এদিকে এসে পড়েছিল চরতে চরতে। হঠাৎ মানুষ দেখে সটান লাফ মেরে পালায়।

বেবী বলে—ওমা ! বার্কিং ডিয়ার !

হাসছে দুজনে। অঞ্জন বলে।

—তুমি ভাবলে বুঝি বাঘই।

বেবী বলে—না স্যার ! এত ভীতু আমি নই।

—তবে ?

হাসে বেবী—দেখলাম তুমি কত ভীতু ! ভয় পেয়ে জড়িয়ে ধরতে তুমি ভাবলে তোমাকে যেন কোন বাঘিনীই জড়িয়ে ধরেছে ! এই বীরপুরুষ তুমি !

হাসছে দুজনে।

রঞ্জনও ব্যাপারটা দেখে অবাক হয়। অঞ্জন চিরকালই লাজুক। মুখচোরা ধরণের ছেলে। মেয়েদের সম্বন্ধে তার মনে একটা আতঙ্ক, অনিহাই দেখেছে রঞ্জন এতকাল। কিন্তু আজ যা দেখেছে তাতে অঞ্জনের সম্বন্ধে তার দৃষ্টিই বদলে গেছে রঞ্জনের। আরও ভয়ের কারণ, বেয়ারা হয়ে মালিকের মেয়ের সঙ্গে নির্জনে প্রেম করছে। জানে যদি ধরা পড়ে যায় বিপদই হবে।

এদিকে রঞ্জন নিজে তো গাঙ্গুলিসাহেবের বড় মেয়ের কাছে ধরা পড়ে গেছে। সে কিছু বলবে না কাউকে। কিন্তু ওই বিচ্ছুর মত ছোট মেয়েটাকে এতটুকু বিশ্বাস নাই রঞ্জনের। মনের উৎকণ্ঠা চেপে বাংলোর আউট হাউসে ফেরে রঞ্জন।

দুপুরে সবাই লাঞ্চের পর জমিয়ে ঘুমুচ্ছে। ওদিকে সর্বেশের ঘর থেকে নাক ডাকার শব্দ ওঠে। কাল অনেক রাতে ফিরেছে সর্বেশ।

রঞ্জন নিজেদের ওই টালির ঘরে গিয়ে ঢুকলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই অঞ্জন ফিরে আসে। রঞ্জনের ঘুম আসেনি। ওকে দেখে চাইল। অঞ্জন বলে।

—ঘুমোসনি ?

রঞ্জন বলে—তোর জন্য ঘুম ছুটে গেছে।

—মানে ?

রঞ্জন গলা নামিয়ে বলে—প্রেমে পড়েছিস তুই ! ব্যাটা বেয়ারা হয়ে ওই বিচ্ছু মেয়েটার প্রেমে পড়েছিস ! যদি ধরা পড়ে যাস ?

অঞ্জন এবার ব্যাগটা নামিয়ে বলে।

—ধরা আগেই পড়ে গেছিরে বেবীর কাছে।

চমকে ওঠে রঞ্জন—মানে ?

—ও জেনে ফেলেছে আমার পরিচয়, আর যা শাসালো আমাকে তাতে তোর পরিচয়টাও বলে ফেলেছি।

—সে কি! রঞ্জন ভীত কণ্ঠে বলে—এখন কি হবে?

অঞ্জন বলে—ওর বড়দিও জেনে গেছে সব কথা। ওরা দুই বোনই সব জেনেছে, তবে এতদিন যখন কিছু বলেনি ওই পাগলা মেজর, সর্বেশকে মনে হয় আর বলবে না।

রঞ্জন কি ভাবছে।

অঞ্জন বলে—এখন ওই দুজনেই চায় সর্বেশের খপ্পর থেকে বাঁচতে। তাই আমাদের সাহায্য চায়।

রঞ্জন বলে—তা তো বুঝলাম, কিন্তু যদি ওই পাগলা মেজর, সর্বেশবাবু আমাদের পরিচয় জেনে ফেলে তাহলে শেষ করে দেবে দুজনকে।

অঞ্জন বলে—তাহলে এসব ছেড়ে চল পালাই!

হাসে রঞ্জন—এত বড় ভীরু কাপুরুষ তুই যে ওদের ভয়ে পালিয়ে যাবি অসহায় মেয়ে দুটিকে এই বনে অমনি একটা হিংস্র পশুর মুখে ফেলে রেখে? তা হতে পারে না অঞ্জন, যত বিপদই আসুক লড়তে হবে। সর্বেশকে শেষ করতেই হবে।

অঞ্জন বলে—বেড়াতে এসে এমনি বিপদে পড়তে হবে ভাবিনি রে।

আজ দুই বোনেও ভাবছে ওই কথাটাই।

আইভি সেই সর্বেশকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। নিজের ওই চরম সর্বনাশ থেকে রক্ষা পাবার জন্যই আজ রঞ্জনের সাহায্য চায়।

আইভি রঞ্জনের আসল পরিচয় পাবার পর খুশিই হয়েছিল। আরও বিশ্বাস করেছিল ওর বন্ধু ওই মঙ্গু আসলে বেয়ারা নয়।

আর তার পরিচয়টাও জেনে নিশ্চিন্ত হয়েছিল, ক্রমশঃ দেখেছে আইভি বেবীকেও অঞ্জনের সঙ্গে মিশতে। দুজনে সেদিন পাম্প চালাচ্ছিল, হাটের পথেও দেখেছিল বেবীকে বেশ হাসি-খুশি অবস্থায়।

আজ দুপুরেও দেখেছে আইভি বেবী আর মঙ্গুকে ওই বনের মধ্যে যেতে।

তাই আইভি এবার বোনকে সাবধান করতে চায়। কোনমতে সর্বেশ যদি জেনে ফেলে ওই চঙ্গু মঙ্গুর আসল পরিচয়। আর ওদের সর্বেশকে হাতে নাতে ধরার ব্যাপারটা তাহলে শেষই করে দেবে সর্বেশ ওই দুজনকে। বনের মধ্যে এখানে দুটো মানুষকে গুম করে, গায়েব করে দেওয়া সবেশের মত লোকের পক্ষে অসম্ভব নয়।

এ হতে দিতে পারে না আইভি।

তাই বেবীকে সাবধান করা দরকার।

বেবী ফিরেছে দুপুরে বন থেকে। ওর সারা মনে অঞ্জনের দেহের সেই সচকিত স্পর্শ তখনও কি মাধুর্যের রেশ আনে।

দিদিকে দেখে চাইল বেবী।

কোথায় গেছলি ওই মঙ্গুর সঙ্গে?

বেবী চাইল দিদির দিকে। আইভি বলে।

—বেয়ারাদের সঙ্গে এত মেলামেশা ভালো নয়।

বেবী বলে—কুক্-এর সঙ্গে তো দেখি তুইও জমে গেছিস।

চটে ওঠে আইভি—মানে?

—মানেটা তুইও জানিস, আমিও!

বোনের কথায় আইভি অবাক হয়, বেবী এবার আইভিকে জড়িয়ে ধরে বলে—রঞ্জনবাবু অঞ্জনবাবুর খবরটা তুইও জানিস, আমিও জেনেছি, ওরা বড় ভালো রে দিদি! আমাদের জন্যেই এইভাবে এখানে পড়ে আছে বেচারারা!

আইভি এবার বুঝেছে বেবীটাও জেনে গেছে সব।

আইভি বলে—এসব কথা খবরদার মা, বাবা ওই সর্বেশবাবুকে ভুলেও জানাবি না, জানতেও দিবি না, ওদের সামনে বয়-বেয়ারা হিসাবেই দাবড়ে কথা বলবি ওদের সঙ্গে। ওরা জানতে পারলে আমাদের বিপদ তো হবেই, ওদের দুজনকেও ছেড়ে দেবে না সর্বেশ। শেষ করে দেবে।

—ইস্! বেবী ফুঁসে ওঠে।

আইভি বলে—এখন সাহস দেখাতে যাস্ নে। সময় এলে ওটা দেখাবি। এখন যা বলি শোন।

বেবী দিদির কথায় সায় দেয়। তবু বলে।

—সর্বেশবাবুর মত শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য সব করতে পারি রে দিদি!

সর্বেশ এবার এখানে বেশ মোটা দাঁওই মেরে চলে যেতে যায়। কিছুদিনের জন্য আর বনের এই কাজ করবে না। একই ধরণের অন্যায় কাজগুলো সে বেশীদিন ধরে করে না। অন্য লাইনের ব্যবসা ধরে, আবার এই লাইনেও আসে তবে বেশ কিছুদিন বাদ দিয়ে। এতে ধরা

পড়ার ভয় কমই থাকে।

তাই সর্বেশ বনের কাজে শেষ দাঁওটা মেরে চলে যাবে এখান থেকে। তার আগে আইভি'র ব্যাপারটাকেও চুকিয়ে ফেলতে চায়। এতদিন ধরে আইভিকে সহজভাবে পাবার চেষ্টা করেছে নানা ভাবে। কিন্তু ওই কৌশলী মেয়েটা প্রতিবারই তাকে এড়িয়ে গেছে নানা ছলে। সর্বেশ হাতে পেয়েও সুযোগ হারিয়েছে। এবার সর্বেশ ভেবে নিয়েছে সোজা পথে কাজ না হলে বাঁকা পথই নেবে সে।

বনের লুটপাটের ব্যবস্থা এবার চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছে। আজ রাতেই দু'ট্রাক মাল পাচার করবে। এটা নিরাপদে বের করতে পারলে কয়েক লাখ টাকা নগদ তার হাতে এসে যাবে, আর এটা চুকোলেই কালই সে বনের পাট চুকিয়ে আইভিদের নিয়ে ফিরে যাবে।

তার আগে আইভিকে হাতে আনতেই হবে।

বৈকাল নেমেছে। ওদিকে বনের মধ্যে সর্বেশের লোকজনও ট্রাক নিয়ে হাজির হয়েছে। বনের গভীরে তারা দামী দামী লগ তুলছে আর শালপাতার নীচে হাতির দাঁত, বেশ কয়েকটা বাঘের চামড়া--এসবও পাচারের জন্য বোঝাই করছে।

খবরটা এসে পেঁছে গেছে ফরেস্ট অফিসার ভোলা তেওয়ারীর কাছেও। ভিখুয়া সর্দার নিজে এসেই খবরটা দিয়ে যায়। ড্রাইভার সিংজীও রয়েছে বনে।

এবার এই ট্রাকগুলো তারা আরও গভীর বনের মধ্য দিয়ে অন্য পথে নিয়ে যাবে। সে সব পথে ফরেস্ট নাকা কিছু কম। আর পথও বন-জঙ্গল আর পাহাড়ে ঢাকা, তাই কিছুটা নিরাপদ।

ভিখুয়া সর্দার ওই পথের কথা জানাতে ফরেস্ট অফিসার বলে,—তোমার লোকজনদের তৈরী থাকতে বলো। আমিও ওই সব ফরেস্ট নাকায় খবর পাঠাচ্ছি যাতে কোন ট্রাকই তারা না ছাড়ে। আমিও বের হবো রাত্রে।

সর্বেশ জানে তার লোকজন মালপত্র ঠিক বোঝাই করে রাখবে। রাতের অন্ধকারে সর্বেশও যাবে তাদের সঙ্গে তৈরী হয়ে। মালপত্র বের করতেই হবে বন থেকে। তার আগে আইভি'র ব্যাপারে সে একটা হেস্তনেস্ত করতে চায়।

দুপুরে রঞ্জনও বের হয়েছে।

সে দেখেছে ওই সর্বেশকে ঘরের মধ্যে জাল পারমিট কাগজপত্র তৈরী করতে।

রঞ্জন এসেছে ফরেস্ট অফিসার তেওয়ারীর ওখানে।

সে বলে—তেওয়ারী, সর্বেশবাবুকে দেখলাম কাগজপত্র তৈরী করছে। তার লোকজন এসেছিল, মনে হয় আজই একটা কিছু করতে চলেছে সে।

ভোলা তেওয়ারী বলে—পারিস তবে চলে আয় আজ রাতে। তোর সর্বেশবাবুকে আজ জালে ফেলতে চাই।

রঞ্জনও তাই চায়। বলে সে।

—ঠিক আছে। চলি—সাহেবের ঘুম ভাঙলে আবার চা দিতে হবে।

ভোলা তেওয়ারী বলে—তাই যা। আর নজর রাখিস ওর উপর। ও বের হলেই যেন খবর পাই।

বৈকাল নামছে। রোদের তেজ কমে স্নিগ্ধতা নামে বনপাহাড়ে। বনে বনে জেগে ওঠে ঘরে ফেরা পাখীদের কলরব। আইভি চলেছে বনের পথ দিয়ে, ঝর্ণার ধারে একটা মাঠে ফুটেছে বুনো অর্কিড ফুল, জায়গাটা ভারি মনোরম। আইভি এখানে এসে বসে, মাঝে মাঝে রঞ্জনও আসে।

এই মনোরম পরিবেশে দুজনে বসে থাকে—আইভি'র মনে সুর জাগে। এই গহন অরণ্য সবুজের স্নিগ্ধতার মাঝে যেন হারিয়ে যায় তারা দুজনে।

আইভি আজ এসেছে ওইখানে।

সর্বেশ ওর উপর নজর রেখেছিল। দেখেছে সর্বেশ মেয়েটা ক্রমশঃ তাকে যেন এড়িয়ে চলছে। তার জন্যই সর্বেশ এত খরচ করেছে। এবার ব্যবসাদার সর্বেশ তার হিসাব মিটিয়ে ফেলতে চায়। সোজা কথায় না হলে সে বাঁকা পথই নেবে।

আইভিকে বনে যেতে দেখে সর্বেশও উঠে পড়ে। পায়ে পায়ে সে বনের দিকে চলে যায়।

মেজর গাঙ্গুলি তখন চা পানে ব্যস্ত, আর মিসেস গাঙ্গুলি অবশ্য তখনও চায়ের টেবিলে সেই সোয়েটার বুনেই চলেছে।

আইভি রঞ্জনের পথ চেয়েই বসে আছে। আসবে রঞ্জন। হঠাৎ পায়ের শব্দে চাইল খুশিভরা চাহনিতে। নিমেষের মধ্যে সেই খুশি পরিণত হয় কি ঘৃণাভরা আতঙ্কে। এসেছে রঞ্জন নয় ওই সর্বেশ।

সর্বেশ বলে—কি হল, খুশি হওনি আমাকে দেখে?

আইভি যেন ধরা পড়ে গেছে। সেটাকে ঢাকবার জন্য বলে।

—না-না। আসুন।

সর্বেশ এসে পাশের পাথরটাতে বসে দেখছে আইভিকে। ওর ডাগর চোখ, সুন্দর ঘাড়, নিটোল হাত, উন্নত বুকের রেখাগুলো আজ সর্বেশের মনে ঝড় তোলে। সর্বেশ আজ যেন পাগলের মত হয়ে উঠেছে। আইভি'র হাতটা ধরে বলে।

—তোমার জন্যেই এই বনে এসেছি আইভি। সারা মন দিয়ে এতদিন তোমাকেই চেয়েছি। কিন্তু তুমি আমার মনের কথাটা বোঝার কোন চেষ্টাই করোনি। নিষ্ঠুরভাবে কেবল দূরেই সরিয়ে দিয়েছো আমাকে। আজ—

চমকে ওঠে আইভি ওই লোকটার কথায়। ওর দুচোখে আজ কি কামনার জ্বালা। আইভি বলে।

—প্লিজ! শুনুন—

হাসছে সর্বেশ। বলে সে—আজ কোন কথাই শুনবো না আইভি, সর্বেশ জীবনে যা চেয়েছে পেয়েছে। তাই আজ আর শূন্য হাতে ফিরবো না। আজ—

দুর্বার এক কামনার জ্বালায় নিষ্ঠুর মানুষটা আজ জড়িয়ে ধরে আইভিকে। যেন বনের গভীরে কোন হিংস্র বাঘ একটা বনহরিণীকে আক্রমণ করেছে। এখুনি ওর ধারালো নখ দাঁত দিয়ে ওই অসহায় বন-হরিণীকে চিরে ফালা ফালা করে দেবে।

আইভি প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারে না। ওই দানবটা আজ যেন তাকে পিষে দলে শেষ করে তার সর্বস্ব লুট করে নেবে।

হঠাৎ নীরব বনভূমি কাঁপিয়ে একটা চাপা গর্জন ওঠে। বনের গাছগুলো যেন ওই গর্জনে কেঁপে ওঠে। বাঘটা এগিয়ে আসছে গর্জন করে শিকারের সন্ধানে।

চমকে ওঠে সর্বেশ। বাঘটার গর্জন কাছেই শোনা যায়। এই দিকেই আসছে শিকারের সন্ধানে। সময় নেই—যে কোন মুহূর্তে ওই হিংস্র বাঘটা এসে লাফ দিয়ে পড়বে তার উপরই।

সর্বেশ আইভিকে ছেড়ে দিয়েছে—গর্জনটা কাছেই শোনা যায়।

সর্বেশ এবার এক লাফে নিরাপদ দূরত্বে পেঁছে তীরবেগে বনবাদাড় ভেদ করে ছুটতে থাকে। বাঘটার থেকে যতদূরে পারে পালাতে হবে। পড়ে রইল আইভি'র অর্ধ অচেতন দেহটা—থাক। সর্বেশের নিজের প্রাণটাই এখানে বড়। তাই প্রাণ নিয়ে পালায় সে বনের মধ্যে বিপর্যস্ত আইভিকে ফেলে রেখে।

আইভি'র সব শক্তি ফুরিয়ে গেছে ওই দানবটার সঙ্গে লড়তে গিয়ে; বাঘের গর্জন শুনে চমকে ওঠে সে। দেখে আইভি ওই বিপদের সময় সর্বেশ তাকে ফেলে রেখেই নিজে প্রাণ নিয়ে দৌড়েছে।

পড়ে আছে আইভি। অসহায় অপমানে সে বিধ্বস্ত। ওই বাঘটা সগর্জনে এগিয়ে আসছে। আজ আইভির বাঁচতেও সাধ নেই। ওই বাঘটা যদি মারে তাকে মারুক, তার সব লজ্জার শেষ হোক।

কিন্তু অবাক হয় আইভি।

গর্জনটা থেমে যায়, এগিয়ে আসছে রঞ্জন।

হাসছে সে। দেখেছে সর্বেশকে ওইভাবে দৌড়তে।

—আইভি।

আইভি'র চোখ বন্ধ। কথা বলার মত অবস্থা তার নেই। রঞ্জনও দেখেছে তার অবস্থাটা। ভয়ে বোধ হয় জ্ঞানই হারিয়েছে।

রঞ্জন ছুটে গিয়ে কিছু কচুপাতা ছিঁড়ে ঝর্ণা থেকে জল এনে আইভি'র মুখে কপালে ছিটোতে থাকে।

—আইভি!

আইভি চোখ খোলে। দেখছে সে রঞ্জনকে।

—তুমি! বাঘ—

হাসে রঞ্জন। বলে সে।

—ভয় নেই। বাঘ এখানে আসে নি। আমিই ওই শয়তানকে ভয় দেখাবার জন্য বাঘের ডাক নকল করে গর্জন করেছি, আর তাতেই বীর-পুরুষ তোমাকে ছেড়ে দিয়ে দৌড়লে।

আইভি বলে—তাই নাকি! তুমি না এসে পড়লে কি সর্বনাশ যে হতো—

আজ বুঝেছে আইভি রঞ্জনই কৌশলে আজ তাকে ওই চরম সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

কোনমতে উঠে বসলো আইভি।

রঞ্জন বলে—আর একটু রেস্ট নাও, তারপর যাবে।

সর্বেশ দৌড়চ্ছে—আর বন-বাদাড় ভেদ করে সর্বেশ এসে হাজির হয় বাংলোয়। ভীত ত্রস্ত অবস্থা।

মেজর গাঙ্গুলি, মিসেস গাঙ্গুলি অবাক হয়!

—কি ব্যাপার!

হাঁপাচ্ছে সর্বেশ। বলে—ব-বাঘ! রয়েল বেঙ্গল টাইগার!

—এ্যাঁ!

মেজর গাঙ্গুলি কিছু বলার আগে মিসেস গাঙ্গুলি বলে।

—সর্বনাশ! আইভি বনে গেছে!

সর্বেশ বলে—কে জানে, বাঘটা ওকেই এতক্ষণে এ্যাটাক করেছে বোধ হয়।

—হোয়াট! গর্জে ওঠে মেজর গাঙ্গুলি। বলে সে।

—বাঘ এ্যাটাক করেছে আইভিকে, আর তুমি ওকে ফেলে পালিয়ে এলে? আমার বন্দুক—

বেবীও এসে পড়ে। বলে সে—দিদি কোথায়?

মেজর গাঙ্গুলি এখন বন্দুক হাতে নিয়ে টোটার মালাটা গলায় ঝুলিয়ে গর্জে ওঠে।

—চলো, বনে চল। দেখছি সেই বাঘকে। আই শ্যাল স্যুট হিম। কাম অন! ইউ চঙ্গু, মঙ্গু।

চঙ্গুর দেখা নেই। মঙ্গুই আসে। ওর কাঁধে একটা কাঠকাটা কুড়াল। সর্বেশ নিয়েছে একটা রড—গাঙ্গুলি সাহেব আগে আগে চলেছে বন্দুক নিয়ে, আর পিছনে রড হাতে সর্বেশ, পিছনে মঙ্গু কাঁধে সেই কুড়াল।

ওরা বনের দিকে চলেছে, বেবীও সঙ্গ নেয় ওদের।

কে জানে দিদির কোন বিপদই হ'ল কিনা। মেজর গাঙ্গুলি বন্দুক কাঁধে হন্ হন্ করে চলেছে। গর্জন করে সে।

—কোনদিকে বাঘ? বাতাও?

মেজর গাঙ্গুলির গোঁফ জোড়া বাঘের ল্যাজের মত হেলছে দুলছে।

সর্বেশ বলে—এইদিকে। একটু হুঁশিয়ার হয়ে চলুন।

—হোয়াই! মেজর গাঙ্গুলি কাউকে ভয় করে না।

সর্বেশ বলে—যদি এ্যাটাক করে আমাদের?

মেজর গাঙ্গুলি গর্জে ওঠে—করুক, লড়ে যাবো। মঙ্গু—পিছনে কুড়াল কাঁধে চলেছে অঞ্জন ওরফে মঙ্গু বলে।—স্যার !

মেজর গাঙ্গুলি হুকুম দেয়—তেমন দেখলে চার্জ—কুড়োল চালিয়ে দেবে একেবারে মাথা লক্ষ্য করে। ফরোয়ার্ড মার্চ !

বনের মধ্য দিয়ে চলেছে মেজর তার দলবল নিয়ে। বাংলোর পোষ্য দুটো নেড়ি কুত্তাও পিছনে চলেছে মজা দেখার জন্য। আদিবাসী মালি টুয়াই মাঝি বলে। —বাঘ নাই বটে, নাহলে কুকুরগুলান সাথে যেত না হে ! বাঘ কুথাকে পাবা ইখানে ?

মেজর গাঙ্গুলি বলে—আলবৎ আছে বাঘ ! আজ সেটাকেই শেষ করবো।

ওরা বনের মধ্যে এসে পড়েছে। সর্বেশ বলে।

—সামনেই বাঘটাকে দেখেছিলাম, গর্জন করছিল।

মেজর গাঙ্গুলি বন্দুকের নল দিয়ে ঘন পাতালতার আবরণ ঠেলে নলটা বের করে ওদিকে পাথরের উপর চেয়ে চমকে ওঠে।

—আইভি ! ইউ চঙ্গু !

সর্বেশও চঙ্গুকে এই নির্জন বনে আইভি'র পাশে বসে থাকতে দেখে চমকে ওঠে।

ব্যাটা বাঘ কিনা সর্বেশের প্রেমপর্বে বাধা দিয়ে তাকে তাড়ালো আর ওই কুক চঙ্গু কিনা আইভি'র পাশে বসে খোশমেজাজে গল্প করছে।

মেজর গাঙ্গুলিও অবাক হয়।

—বাঘ কোথায় ? ইউ আইভি—ঠিক আছ তো ?

আইভি বলে ওঠে—ও ড্যাডি। তুমি এসে গেছ ? সর্বেশদা তো বাঘের ডাক শুনে পালালো আমাকে ছেড়ে—একেবারে ফেইণ্ট হয়ে গেছলাম ভয়ে।

চঙ্গু বলে—বনে কাঠ নিতে এসে মেমসাহেবকে পড়ে থাকতে দেখে জল-টল দিয়ে জ্ঞান ফেরালাম স্যার !

বেবী এগিয়ে যায়—কিছু হয়নি তো দিদি ?

—না রে ! জোর বেঁচে গেছি। খুব সময়ে চঙ্গু এসে পড়েছিল।

মঙ্গু অর্থাৎ অঞ্জনও ব্যাপারটা দেখছে। সর্বেশ, মেজর গাঙ্গুলি দুজনেই ঘটনাটা ঠিক সহজভাবে মেনে নিতে পারে নি। সর্বেশ বলে।

—তাহলে বাঘটা গেল কোথায় ? এত কাছে শিকার পেয়ে কিছু না করে চলে গেল ?

মেজর গাঙ্গুলিও ভাবছে—হুঁ, তাই তো ভাবছি। ওয়েল—কাম্পে চল। এর সঠিক তদন্ত করতেই হবে। মেজর গাঙ্গুলির চোখে ধুলো দেবে? ইমপসিবল।

ওরা দল বেঁধে বাংলোয় ফেরে। মিসেস গাঙ্গুলি আইভিকে সুস্থ শরীরে ফিরতে দেখে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে বলে। —একা একা এই বনে আর যাসনে বাছা। কত জন্তু জানোয়ার ঘুরছে চারিদিকে।

আইভি বলে সর্বেশের দিকে চেয়ে।

—তা সত্যি মা। চারিদিকে জন্তু জানোয়ারের অভাব নেই। কখন যে কি সর্বনাশ করে কে জানে? মনে হয় এ বনে আসা ঠিক হয় নি।

মা বলে—আর ক'টা দিন। তারপরই ফিরে যাবো। কি বলো সর্বেশ?

সর্বেশ বলে—তাই যাবো। ফিরেই যাবো।

মেজর গাঙ্গুলি তখনও ভাবছে। হুঙ্কার ছাড়ে সে।

—কিন্তু বাঘটার কি হ'ল? সর্বেশ—আসলে বাঘ দেখেছিলে না আওয়াজ শুনেই দৌড়েছিলে? স্পিক আউট!

সর্বেশ বলে—ডাকই শুনেছিলাম।

—হুম! কেসটা বেশ জটিলই। মেজর গাঙ্গুলি মন্তব্য করে।

হঠাৎ গর্জে ওঠে—ইউ ব্লাডি চঙ্গু, যখন তখন কাজ ফেলে বনে যাও কেন? যাও—জলদি চা বানাও। ফাঁকিবাজ কাঁহিকা!

চঙ্গু বলে—গাল দেবেন না স্যার।

এবার সর্বেশ গর্জে ওঠে—ফের কথা!

ওই চঙ্গুকেই সন্দেহ হয় তার। কিন্তু সোজাসুজি বলতে পারে না। ধমকায় সর্বেশ।

—কালই মাইনে পত্র বুঝে নিয়ে চলে যেও, দরকার নাই এমন কুকের!

চঙ্গু বলে—কাল কেন স্যার! আজই মিটিয়ে দেন।

মেজর গাঙ্গুলি গর্জে ওঠে—সাট আপ্! পালাতে চাও! মেজর গাঙ্গলির এনকোয়ারীর নাম শুনে পালাতে চাও! এ্যাঁ, এ হতে দেব না। যাও, চা করে আনো। পরে দেখছি।

সর্বেশ জানে আজ রাতে তাকে অপারেশনে বের হতে হবে। আজকের অপারেশন ঠিক মত করতে পারলে নগদ দু'তিন লাখ টাকা আমদানী হবে। তারপর এবার জোর করেই ওই মেয়েটাকে দখল করবে।

ওর মুক্তির কোন পথই নাই। আইভি'র বাবা মা তাকে সর্বেশের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হবেই।

সর্বেশ বলে—সন্ধ্যার পর খাবার তৈরী করো, রাতে বের হবো একটু কাজে।

ব্যাপারটা বুঝেছে রঞ্জন। আর রঞ্জনও সেই মত অঞ্জনকে দিয়ে খবর পাঠায় ভোলা তেওয়ারীকে। সর্বেশের ব্যাপারে তেওয়ারীও এবার যথাবিহিত ব্যবস্থা নিয়েছে।

সর্বেশ চুপ চাপই রয়েছে।

মেজর গাঙ্গুলি বলে, যা হবার হয়ে গেছে সর্বেশ। এত ভাবছো কেন?

মিসেস গাঙ্গুলি বলে—যাক, কিছুতো হয়নি মেয়েটার। এখন ফিরে গিয়ে তোমাদের বিয়েটা চুকিয়ে দিতে চাই।

সর্বেশ ভুলতে পারে না আইভি আর ওই কুক-এর ঘনিষ্ঠতার কথা। তারও মনে হয় তাকে বোকা বানিয়েছে ওই চঙ্গু।

সর্বেশ বলে মেজরকে

—ওই কুকটাকে কালই তাড়ান। আমার ওই চঙ্গুকেই সন্দেহ হচ্ছে।

মেজর গাঙ্গুলি বলেন—আমি তদন্ত করছি। তেমন দেখলে ওকে আমি কোর্ট মার্শাল করবো। গুলি করে মারবো। এতবড় সাহস ওর? তুমি নিশ্চিন্ত থাক সর্বেশ। তোমাকে বোকা বানাবে, এ আমি সইব না।

সর্বেশ উঠে যায়।

তার নিজের কাজে বের হতে হবে। সন্ধ্যার পরই সারা বনে নামে আদিম অন্ধকার। রাতের বেলায় এই অরণ্যের রূপই বদলে যায়।

জোনাকি জ্বলে, হাওয়ায় কাঁপে গাছগাছালি দূর আকাশ কোলে দু'একটা ভীরু তারার চাইনি ফুটে ওঠে। বনের গভীরে নীল চোখ জ্বলে—বনের বাঘ-ভালুক-হিংস্র প্রাণীর দল বের হয় তাদের পরিক্রমায়। কোথায় বনে আর্তনাদ ওঠে—কোন এক নিরীহ প্রাণী পরিণত হয় রক্তাক্ত শিকারে।

সর্বেশ জানে এই অরণ্যে বাচাঁর লড়াই চলে প্রতিনিয়ত। সেও এখানে এসে সেই অনেক পাবার লড়াই-এ সামিল হয়ে গেছে।

এই লুন্ঠনের লড়াই-এ তাকে জিততেই হবে। তারপর জিতে নেবে ওই আইভিকে।

সর্বেশ জিপ নিয়ে এসেছে বনের গভীরে সেই গোপন ডেরায়।

মালপত্র সব ঠিকমত বোঝাই করা হয়েছে কিনা দেখে নিচ্ছে। তারপর রাতের অন্ধকারে তার যাত্রা শুরু হবে বনের পথে।

যেভাবে হোক দুটো ফরেস্ট গেট পড়ে—তাকে পার হতে হবে। এতদিন সর্বেশ টাকা দিয়ে নিরাপদেই পার হয়েছে আজও সেই ভাবেই পার হয়ে যাবে। ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টও টের পাবে না।

কিন্তু ভোলা তেওয়ারী এসে বেশ পরিশ্রম করে সর্বেশের সব খবরই যোগাড় করেছে। আর জেনেছে আজ রাতেই শুলুক পাহাড়ীর বন দিয়ে পার হবে ওই সব মালপত্র, তেওয়ারী আগে থেকেই চেকপোস্টগুলোয় কড়া পাহারার ব্যবস্থা করেছে। একটা নাকাতে সে নিজে হাজির থাকছে। সারা বনে বেশ কয়েকটা ফরেস্ট নাকা অর্থাৎ চেকপোষ্ট আছে, এতদিন সেগুলোতে ফরেস্ট গার্ডরা ঘুমিয়েই থাকতো।

এবার তেওয়ারী এসে ওদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। ক'দিন থেকে ওয়াকিটকিতে তাদের মাঝরাতে ডাকাডাকি করে তেওয়ারী। কোনরাতে নিজেই গিয়ে হাজির হয় জিপ নিয়ে।

কড়া চৌকিংও চালু করেছে।

আজ তারও একটা কঠিন পরীক্ষা। তেওয়ারী তার জন্য তৈরী হয়েছে। এতবড় একটা চক্রকে ধরতেই হবে।

মেজর গাঙ্গুলিও বেশ ভাবনায় পড়েছে।

তার মাথায় কথাটা গেড়ে বসেছে। বাঘের ব্যাপারে একটা গোলমাল কিছু আছে।

বেবী আজ দিদির ব্যাপারটাতে বেশ ভয়ই পেয়ে গেছল। কিন্তু বনে গিয়ে ওই রঞ্জন আর দিদিকে সহজ ভাবে বসে থাকতে দেখে অবাক হয়। যেন তেমন কিছুই হয়নি। বাঘ সম্বন্ধে কোন গুরুত্বও দেয়নি তারা।

বেবী তাই দিদিকে ধরেছে। সন্ধ্যার পর বাংলোর ঘরেই আড্ডা জমে। ওদিকে সর্বেশও বের হয়ে গেছে না খেয়েই। মেজর গাঙ্গুলি, মিসেস গাঙ্গুলিরও ভালো লাগে না ব্যাপারটা, সর্বেশ যেন খুশি নয়। এতে ওদেরও মেজাজ বিগড়ে গেছে।

মেজর দু' এক পেগ মদ্য পান করে মেজাজটাকে শান্ত করার চেষ্টা করে।

ওদিকের ঘরে বেবী আইভি দুই বোনে কথা বলছে।

বেবী বলে—দিদি, আজ ওই সর্বেশদা এমনি ব্যবহার করেছিল তোর সঙ্গে?

আইভি বলে—ওই রঞ্জনবাবু না এসে পড়লে কি যে হতো জানিনা রে। চঙ্গুই বাঁচালো আজ ওই বাঘের ডাক নকল করে।

হাসছে বেবী—চঙ্গুর তো দারুণ বুদ্ধি রে! এ্যাঁ—নকল বাঘের ডাক শুনেই ওই সর্বেশ দে দৌড়। তা দিদিভাই এবার তোর চঙ্গুকে বল্—চিরকালের জন্য ওই শয়তানের হাত থেকে তোকে বাঁচাক। সর্বেশকে ফুটিয়ে দে—ব্যাটা ইতর জানোয়ার।

আইভি বলে—তাই বলবো। চঙ্গুও মনে হয় রাজী হবে। তাই কলকাতা গিয়ে চাকরীটা পেলে বাড়ি ছেড়েই চালে যাবো। সর্বেশকে বুঝিয়ে দেব—আমি বিকিকিনির পশরা নই যে বাবাকে দাম দিয়ে আমায় কিনে নেবে।

বেবী বলে—চঙ্গুকেও বল সব কথা!

মেজর গাঙ্গুলি এদিকে আসছিল। নির্জন বাংলোর ঘরে ওই দুই বোনের সব কথাগুলোই শুনেছে মেজর গাঙ্গুলি। আর তার বুঝতে বাকী নেই যে বাঘের ডাক ফাক সব মিথ্যা! ওই কুক চঙ্গুই এখন আইভি'র প্রেমিক, সর্বেশের হাত থেকে সেই-ই আইভিকে ছিনিয়ে নিতে চায়। তার জন্যই সর্বেশকে তাড়িয়েছে বাঘের ডাক নকল করে।

মেজর গাঙ্গুলি নিজেও দেখছিল বনের মধ্যে ওই রাঁধুনি চঙ্গুকে আইভি'র পাশে বসে সহজভাবে কথা বলতে।

আজ মেজর গাঙ্গুলি বুঝেছে ওই সব ষড়যন্ত্রের কথা। কোথাকার কে একটা চাকর-বাকর এসে তার বাড়া ভাতে ছাই দেবে! সর্বেশকে চটালে মেজরের সর্বনাশ হবে। আজ মেজর গাঙ্গুলি ব্যাপারটা বুঝে গর্জে ওঠে। আজ সে একটা গভীর ষড়যন্ত্রের খবরই পেয়েছে। ওই চঙ্গু, মঙ্গু এসে তার মেয়েদের বিগড়ে দিয়েছে। আইভি আজ চঙ্গুর সঙ্গে বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার কথাই ভাবছে।

মেজর আজ চঙ্গুকেই এর সমুচিত জবাব দেবে! সে গর্জে ওঠে—চঙ্গু কোথায়? বোলাও উস্‌কো—মেজর এবার হাণ্টার বের করেছে। ওই বেয়াড়া বেয়ারার পিঠের ছালই তুলে দেবে।

চঙ্গুকে বোলাও! কল দ্যাট হারামজাদা!

কিন্তু বাংলোতে চঙ্গুর দেখা মেলে না।

চঙ্গু কোন ফাঁকে বাংলো থেকে বের হয়ে গেছে। খুঁজছে সবাই। তার পাত্তাই নেই।

এদিকে সর্বেশও বের হয়ে গেছে বাংলো থেকে। মেজর গাঙ্গুলির মনে হয় এর মূলে ওই চঙ্গুই।

আর চঙ্গুকে না পেয়ে মেজর গাঙ্গুলি এবার মঙ্গুকেই ধমকায়—কোথায় গেছে সেটা? দ্যাট চঙ্গু?

মঙ্গু বলে—আমি জানি না স্যার!

মেজর গাঙ্গুলি বলে—পালায়নি তো?

—না স্যার? পালাবে না। গেছে কোথায়—এসে পড়বে।

মেজর বলে—এলে দেখা করতে বলো। কাল সকালেই ওকে কোর্ট মার্শাল করবো। টেল হিম—আই ওণ্ট টলারেট!

মঙ্গু মাথা চুলকে ইংরেজী না জানার ভান করে গাঁইয়াদের মত শুধোয়—কি সব বলছিলেন স্যার ইংরিজিতে?

মেজর বলে বিচার করবো ওর। এত বড় শয়তান ওই চঙ্গু। আসুক সে।

রাতের অন্ধকারে রঞ্জন ওরফে চঙ্গু চলেছে ভোলা তেওয়ারীর জিপে। কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরীও রয়েছে, ওরা চলেছে গভীর বনের মধ্য দিয়ে শিকারী রোড ধরে। বনের ভিতরে সরু পথ, ওরা সর্টকাট করার জন্য ওই পথ ধরে ঘন গাছ গাছালির বুক টপকে—ঝোরা নালা পার হয়ে চলেছে।

ঘড়ি দেখছে তেওয়ারী, ওরা এসে হাজির হয়েছে সামনের ফরেস্ট নাকায়। এখানকার সেন্ট্রীরাও জেগে আছে।

ওরা জিপ থেকে নেমে এদিক ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

দূরে নিস্তব্ধ বনের মধ্যে ট্রাকের গর্জন শোনা যায়। হেড লাইটের আলোর ঝলক পড়ে গাছগাছালির মাথায়, অন্ধকার ফুঁড়ে ওই আলোর রেখাটা এগিয়ে আসছে।

ট্রাক দুটো আসছে বনের পথে। রাতের হিম ভিজে পথ—আদিম অন্ধকারে আলোর রেখাটা পথের সন্ধান করে চলেছে—ছুটে চলেছে ট্রাক দুটো, পিছনের জিপে রয়েছে সর্বেশ তার বিশ্বস্ত অনুচর ধানু মাহাতো।

লোকটা নিষ্ঠুর। আর বনের অন্ধিসন্ধি চেনে। এই বনের লুণ্ঠনকারী-

দের মধ্যে সেইই সব থেকে কৌশলী। সর্বেশ তাকেও সঙ্গে নিয়ে এই কাজে নেমেছে!

ধানু মহোতো বাইরে নজর রাখছে। এ পর্যন্ত বিনা বাধাতেই তারা পার হয়ে এসেছে। লরিতে রয়েছে কাঠ—তার জন্য একটা পারমিটও রয়েছে, অবশ্য অনুধাবন করে দেখলে তবে বোঝা যাবে ওসব কাগজপত্র জালই :

রাতের অন্ধকারে ঘুমন্ত ফরেস্ট গার্ড ওসব দেখবে না, কাগজ দেখেই সে গেট খুলে দেবে। আর হাতে গুঁজে দেবে দুখানা একশো টাকার নোট। ট্রাক বের হয়ে যাবে।

পরের গেট টপকাতে পারলেই হাইওয়ে। সেখানে বনবিভাগের আর করার কিছু নেই।

ওই এলাকায় কর্তাদের ধানু মাহাতো হাতে রেখেছে বিশেষ প্রণামী দিয়ে।

এখন বন পার হতে পারলেই কাম ফতে।

লালাজীর গুদামে মাল ঢুকে যাবে—ওদের হাতে আসবে নগদ ক্যাশ।

গেটের মুখে রাস্তাটা সরু, একদিকে খাড়া পাহাড় অন্যদিকে খাদ। রাতের অন্ধকারে খাদের বুকে গাছগাছালিগুলো দেখা যায় কিছুটা, তারপর অতল অন্ধকার।

বহু নীচে একটা ছোট ঝোরা বয়ে চলেছে।

ট্রাক দুটো গেটে এসে থামে।

ড্রাইভার নেমে ওই গেট অফিসের চালার দিকে এগোতে যাবে হঠাৎ দুদিক থেকে ভোলা তেওয়ারী আর কিছু গার্ড ঘিরে ফেলে ট্রাক দুটোকে।

ফরেস্ট অফিসার হাঁক দেয়।

—গেট মৎ খুলনা। ট্রাক নেহি যায়েগা!

ছায়ামূর্তির দলকে দেখে এবার পিছনের জিপে ধানু মাহাতো গর্জে ওঠে—নিকাল চলো গেট তোড়কে!

গেট বলতে একটা বাঁশ আড়াআড়ি ভাবে আংটায় আটকে পথ রোধ করা হয়েছে, সামনের ট্রাকের ড্রাইভার সরযূ সিং এসব কাজে পোক্ত। সে তাই স্টার্ট দিয়ে সবেগে গেটের বাঁশটাকে আঘাত করতে ছিটকে পড়ে গেট, ট্রাকটা বের হয়ে যাচ্ছে, পিছনের ট্রাকও বের হবে এমন সময় ভোলা

তেওয়ারী গর্জে ওঠে।

—ফায়ার। ট্রাক রোখ দো—

অন্ধকার বিদীর্ণ করে কয়েক রাউণ্ড গুলি চলে। ট্রাক দুটোর টায়ারও ফেঁসে গেছে, ফলে অচল হয়ে যায় ভারি লোডেড় ট্রাক দুটো, আর ওই ড্রাইভার খালাসীর দল লাফ দিয়ে নেমে পালাবার চেষ্টা করে বনের মধ্যে।

একজনকে লাঠির ঘায়ে ছিটকে ফেলে ভিখুয়া সর্দার।

সেই খালাসীটাই ধরা পড়ে—বাকীরা পালিয়ে যায়।

ধানু মাহাতো সর্বেশ ভাবতেও পারেনি যে দূর বনের এই অখ্যাত চেকপোস্টে তাদের ধরার জন্য জাল পেতে ছিল ওই ভোলা তেওয়ারী।

সর্বেশ আরও অবাক হয় হেডলাইটের আলোয় তেওয়ারীর জিপে তাদেরই কুক সেই চঙ্গুকে দেখে। সে ব্যাটাই তাহলে বনবিভাগের নাহয় পুলিশের চর। কৌশলে বেয়ারার চাকরী নিয়ে এসে বাংলোয় জুটে তার উপর নজর রেখেছিল।

ওই চঙ্গুর জন্যই সর্বেশ আইভিকে হাতে আনতে পারেনি আজও, বারবার ওর কাছে ঘা খেয়ে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে।

আজ ওই চঙ্গুর জন্যই সর্বেশ চরম বিপদে পড়েছে। লাখ লাখ টাকার ব্যবসা চৌপাট হয়ে গেল, এখন ধরা পড়লে তার সব কীর্তি কাহিনীর কথা ফাঁস হয়ে যাবে, জেল বাসও অবধারিত।

ধানু মাহাতো বলে—কেস গড়বড় সাব। উলোক একদম কব্জা কর লিয়া, অব ভাগিয়ে যেইসে হো!

পালাতে হবে তা সর্বেশও বুঝেছে। এখান দিয়ে নয়—রাতের অন্ধকারে অন্য গেট দিয়ে পালাবার চেষ্টা করতে হবে, না হলে গাড়ি ফেলে হাঁটা পথে এই দুর্গম বিপদসঙ্কুল বন পাহাড়ের পথে হেঁটেই পালাবার চেষ্টা করতে হবে।

তাই ওদিকে যখন ওরা ট্রাকগুলো সামলাতে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে সর্বেশ জিপটাকে কোনমতে ব্যাক করিয়ে টপ গিয়ারে তুলে পালাবার চেষ্টা করে।

দু'একটা গুলি এসে পথের ধারে ছিটকে পড়ে।

ওই গুলিবর্ষণের মাঝ দিয়ে মরীয়া হয়ে কোনমতে পালালো সর্বেশ।

ভোলা তেওয়ারী গর্জে ওঠে।

—ব্যাটা ভেগে গেল!

সে ওয়াকিটকিতে অন্য চেকপোষ্টদের সতর্ক করতে থাকে যেন ওই জিপ দেখলেই আটকানো হয় ওদের সওয়ারীদের। কাউকে ছাড়া চলবে না।

ভোলা তেওয়ারী ট্রাকগুলো ধরে এবার সার্চ করতেই পেয়ে যায় লুকোনো হাতির দাঁত, চামড়ার স্তূপ যার দাম কয়েক লাখ টাকা। আর চোরাই কাঠ জাল পারমিট সবই পেয়ে যায়, সর্বেশের নামে।

কিন্তু সর্বেশকে হাতে পেয়েও ধরতে পারেনি, তাই তাকে ধরার জন্য এবার সারা বনরাজ্য তোলপাড় করে তুলেছে মিঃ তেওয়ারী।

রাতভোর নিজেও জিপ নিয়ে ঘুরছে ওর সন্ধানে।

হঠাৎ ওয়াকিটকিতে মেসেজ আসে নামকাটি ফরেস্ট নাকায় সর্বেশকে ধরা গেছে জিপ সমেত, তবে ধানুকে পাওয়া যায়নি। সে জাল কেটে পালিয়েছে।

খবর পেয়ে মিঃ তেওয়ারী দৌড়লো জিপ নিয়ে নামকাটি ফরেস্ট নাকার দিকে পুলিশ বাহিনী নিয়ে।

ওই চোরাই চালানকারীকে ধরে পুলিশের হাতে না দেওয়া অবধি তার শান্তি নাই।

ভোর হয়ে আসছে।

এবার ফিরছে রঞ্জন রাতে বনে অপারেশন চালিয়ে, আজ সেও নিশ্চিন্ত হয়েছে যে এবার হাতে নাতে ধরা পড়েছে ওই সর্বেশ সরকার। এতদিন ধরে এই বনের সর্বনাশ করে এসেছে সে, বহু হাতি, বাঘ, হরিণ মেরেছে তার লোকজন, বহু দামী গাছকে শেষ করেছে, অরণ্যভূমিকে লুণ্ঠন করেছে নিজের স্বার্থে, টাকার লোভে।

সর্বনাশ করতে সাহসী হয়েছে বহু লোকের।

আইভিকেও শেষ করতো সে, কিন্তু তা হতে দেয়নি রঞ্জন, এবার সর্বেশকে ধরেছে পুলিশ। আপাততঃ পুলিশ হাজতেই গেছে, এরপর যাবে জেলে, শুধু বিচারের অপেক্ষা। একটা শত্রুকে শেষ করে রঞ্জন খুশি মনে ফিরছে ফরেস্ট বাংলোয়।

পৌঁছেই এবার রঞ্জন যেন তোপের মুখেই পড়েছে। মেজর গাঙ্গুলি গর্জে ওঠে—হল্ট। ইউ ট্রেটার। মেজর গাঙ্গুলির চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। আজই কোর্ট মার্শাল করবো তোমার।

মেজর গাঙ্গুলি রাতভোর আজ ঘুমুতে পারেনি।

সর্বেশ কাল সন্ধ্যায় নিদারুণভাবে ঠকেছে ওই চঙ্গুর কাছে। বাঘ-এর ডাক নকল করে চঙ্গু তাড়িয়েছে সর্বেশকে, আর সে নিজে বেয়ারা হয়েও প্রেম করতে সাহস করে তারই মেয়ের সঙ্গে।

আজ মেজর গাঙ্গুলি তাই চটে উঠেছে।

চঙ্গুকে পায়নি মঙ্গু অর্থাৎ অঞ্জনকে পেয়ে তাকেই আটকে রেখেছে, এবার চঙ্গুকে ফিরতে দেখে মেজর গাঙ্গুলি বন্দুক উঁচিয়ে এসে হাজির হয়।

—কোথায় ছিলে রাতভোর বনে ?

সর্বেশ কোথায় ?

চঙ্গু নিপাট ভালোমানুষের মত বলে।

—আমি কিছু জানি না স্যার, সর্বেশবাবুর খবরও জানি না। আমি ফরেস্ট কলোনীতে এক চেনা বন্ধুর ওখানে গেছলাম।

—ইউ লায়ার। কাল সর্বেশকে তুমিই নকল বাঘের ডাক শুনিয়ে বোকা বানিয়ে তাকে সরিয়ে আইভি'র সঙ্গে প্রেম করছিলে।

—না স্যার। আমি সামান্য বেয়ারা—

মেজর গাঙ্গুলি গর্জে ওঠে।

—বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে চাও। বেয়ারা হয়ে প্রেম করো মেম-সাহেবের সঙ্গে ? লভ—

—না স্যার। এসবে আমি নাই স্যার। আমাদের টাকা পয়সা বুঝিয়ে দেন চলে যাবো !

—নো। গেট রেডি। তোমাকে শেষ করবোই, গুলি করে মারবো। যেতে তোমাকে দেব না।

আইভি চমকে ওঠে। বাবাকে বিশ্বাস নাই !

আইভি বলে—বাবা, সর্বেশদাকে ফিরতে দাও। তার কথা শুনে তারপর বিচার করো, শাস্তি দিও।

-কিন্তু কোথায় গেল সর্বেশ ? ওই চঙ্গুই তাকে অপমান করেছে, ইনসাল্ট করেছে তাই চলে গেছে সে, ওকেই তার কাছে ক্ষমা চেয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে, নাহলে ওকে ছাড়বো না। আই শ্যাল স্যুট দ্যাট চঙ্গু !

ওদিকে নাটক তখন অন্যদিকে মোড় নিয়েছে।

রঞ্জনরা ভেবেছিল সর্বেশের পালা শেষ হয়ে গেছে, এবার সে আর অঞ্জন ফিরে যাবে কলকাতায়, সেখানে গিয়ে আইভি'র ব্যাপারটার সিদ্ধান্ত নেবে। দরকার হলে অঞ্জনও ভাববে বেবীকে নিয়ে ঘর বাঁধার কথা।

কিন্তু এভাবে আটকে পড়বে ভাবেনি। আর মেজর বন্দুক তুলে এমন নাচন কোঁদন সুরু করেছে যে গুলিই না চালায়।

কিন্তু এর মধ্যে আর একটা ঘটনা ঘটে গেছে যার খবর রঞ্জন অঞ্জনরা জানে না। জানার সুযোগও ছিল না।

রঞ্জনের বাবা সমরেশবাবু এমনি ব্যস্তবাগীশ, ভীতু ধরণের মানুষ।

রঞ্জনরা ওই বনে গেছে বেশ কিছুদিন, কিন্তু কোন খবরই পায়নি সমরেশবাবু, ওর স্ত্রীও ভাবনায় পড়ে। শেষ অবধি অঞ্জনদের বাড়িতেও খবর নেয়, কিন্তু অঞ্জনের বাবা মাও ভাবছে, ছেলেটার কোন খবর নাই।

তখন দুই পরিবার মিলেই ছেলেদের নিয়ে বিব্রত। সমরেশবাবু স্ত্রীকে বলেন।

ছেলের বিয়ে থা'র ঠিক করলাম, তুমিই কাঁচিয়ে দিলে।

অঞ্জনের মাও বলে।

—এবার ওদের বিয়ে থা ই দিন। নিজেরা পছন্দমত বিয়ে করতে চায় তাই করুক।

সমরেশবাবু বলেন।

—তাই করুক, কোন আপত্তি করবো না। ঘাড়ে জোয়াল না চাপলে ওদের মন ঘরমুখো হবে না। এবার তাই করবো।

সমরেশের স্ত্রী বলে।

—ওসব পরের কথা। এখন ছেলেদের খবরটা নাও। ওই বনে কোথায় কি ভাবে আছে কে জানে? তুমি বরং দামু ঠাকুরপোকে ফোন করো বড়বিলে, ওই শহর থেকেই নাকি ওই বনে যেতে হয়। ঠাকুরপোর ওখানে সবই তো চেনাজানা, ও যদি খবর নিতে পারে ছেলেদের।

যুক্তিটা মন্দ নয়।

তাই সঙ্গে সঙ্গে ফোন করা হল বড়বিলে শমনদমনবাবুর বাড়িতে।

আর শমনদমন নিজে রাজনীতি আর ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর কাজেই ব্যস্ত থাকেন, নিজের বিরাট ঠিকাদারির ব্যবসা। কয়েকটা আয়রণ ওর মাইনস্-এর নামকরা ঠিকাদার তিনি, নিজেও ওই

এলাকার এম-পি। জনপ্রিয় নেতা।

শমনদমনের ছেলেপুলে নেই, ভাইপো রঞ্জনই তার সব। তার বন্ধু অঞ্জনকেও চেনেন তিনি। শমনদমনবাবু ফোন পেয়ে চমকে ওঠেন। বিশাল দশাসই চেহারা, মাথাজোড়া চকচকে টাক তার টাকার প্রাচুর্য জাহির করে। একজোড়া গোঁফও রয়েছে, যেটা তার হাতের সযত্ন সেবায় বেশ নধর হয়ে উঠেছে।

ফোন পেয়ে গর্জে ওঠেন শমনদমনবাবু।

—সেকি! ওই অর্বাচীন গাড়োল দুটো এখানের মীরপুর ফরেস্ট বাংলোতে রয়েছে অথচ আমাকে খবর দেয়নি।

সমরেশবাবু এপ্রান্ত থেকে বলেন।

—আমাদেরও কোন খবর দেয়নি, তোর বৌদি—অঞ্জনের মা বাবাও ভাবছে। বলেছিলাম তোর সঙ্গে দেখা করতে তাও করেনি। যেভাবে হোক, দুটোর খবর যোগাড় করে জানা। তেমন বুঝলে ওদের বের করে আনবি বন থেকে।

বিয়ে থাও করলো না—এইভাবে বনে বনে ঘুরবে, আমরা ভেবে মরছি।

শমনদমন গর্জে ওঠে।

—আর ভাবতে হবে না। আমাকে জানিয়েছ আমি নিজে গিয়ে দেখছি। ওদুটোর সব ভার আমার উপরই ছেড়ে দাও। অমন ইডিয়ট গাড়োলদের সযুত করতে আমি জানি। কাল রাতে না হয় পরদিনই ফোনে সব ব্যাপারটা জানাচ্ছি। কোন ভয় নাই।

আজ রাত হয়ে গেছে—ভোরেই বের হয়ে ফরেস্ট বাংলোতে যাচ্ছি ওদের সন্ধানে।

শমনদমনবাবুর এসব বনপাহাড়ে বিচরণ করার অভ্যাস আছে, তাই ভোর রাতেই তিনি জিপ নিয়ে বের হয়ে পড়েন।

এই বনের পথ তাঁর চেনা। তাই সহজেই পেঁাছে যান ফরেস্ট বাংলোয়, তখন পূর্বদিক সবে ফরসা হচ্ছে, আকাশে প্রথম আলোর আভাষ জেগেছে।

শিশিরভেজা বনে বনে পাখীদের কলরব ওঠে, শমনদমনবাবুর জোঙ্গা জিপটা অনায়াসে চড়াই ঠেলে বাংলোর সামনে এসে থামে।

আর শমনদমনবাবু দেখেন রঞ্জন আর অঞ্জন পরণে বেয়ারার মত হাফ প্যাণ্ট, ময়লা সার্ট পরে ঝুলঝাড়া ভীত চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর এক গোবদা ভদ্রলোক বন্দুক তুলে গর্জাচ্ছে।

—ইউ চঙ্গু, মঙ্গু ইস্টনাম স্মরণ করো। গুলি করে দুটোকেই শেষ করবো। ওয়ান—টু—

একটা মেয়ে ব্যাকুলভাবে আর্তনাদ করে।

—বাবা। কি করছ?

গোবদা ভদ্রলোকের মেয়ে বোধ হয়। ভদ্রলোক গর্জে ওঠে।

—নো বাবা বিজনেস! এত বড় সাহস ওই কুক আর বেয়ারার আমার মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে? শেষ করবো ওই চঙ্গু, মঙ্গুকে—ব্যাটা বেয়ারার দল—টু—

এবার শমনদমনবাবুই তার রাইফেল বের করে গর্জে ওঠে—ইউ গোবদা—কাকে কি বলছ? ওরা কুক—বেয়ারা কেন হবে? ওদের চেন না?

মেজর গাঙ্গুলি কেন এবার রঞ্জন, অঞ্জনও চাইল।

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে রঞ্জন।

—কাকাবাবু!

মেজর গাঙ্গুলি বলে—হু আর ইউ। মেজর অরিদমন গাঙ্গুলি আমি ইট ইজ মাই অর্ডার।

শমনদমন গর্জে ওঠে।

—আমি শমনদমন চ্যাটার্জি এম. পি। ওসব নাটক বন্ধ করো। কুক—বেয়ারা! কাদের কি বলছ? গাড়োলরা আমার ভাইপো ডঃ রঞ্জন চ্যাটার্জি এনাদার গাড়োল ওই অঞ্জন ব্যানার্জি প্রফেসার জুয়োলজি—

মেজর গাঙ্গুলি অবাক হয়।

—মানে!

—মানে অতি সোজা! ওরা বেয়ারা আদৌ নয়। বন্দুক নামাও! ধমকের চোটে মেজর গাঙ্গুলি এবার ঘাবড়ে গিয়ে বন্দুক নামায়। মিসেস গাঙ্গুলি দেখছে রঞ্জন, অঞ্জনকে।

বলে সে।

—তোমরা বেয়ারা নও? আগে এসব কথা বলোনি তো?

অঞ্জন বলে—কিছু বলার সময় উনি দিলেন? এনে বেয়ারা আর ওকে

কুক বানিয়ে দিলেন।

মেজর গাঙ্গুলি এবার বলে।

—ইউ আর ডিসমিসড। তোমাদের চাকরী থেকে বরখাস্ত করলাম, এই মুহূর্তে। ইউ মে গো। যেতে পারো তোমরা।

বলে রঞ্জন।

—দশদিন নাকদম করে খাটিয়েছেন দুজনকে, দৈনিক তিরিশ টাকা করে দশদিনে তিনশো টাকা—দুজনের ছ'শো টাকা পাওনা হয়, মিটিয়ে দিয়ে তবে চাকরী নট করবেন। এখুনি টাকাটা ফেলে দিন ব্যস।

শমনদমনবাবু ব্যবসা বোঝেন, তাই হিসাবের কথায় বলেন।

—করেক্ট। ওদের টাকা মিটিয়ে ওদের স্যাক করবেন। তার আগে নয়।

মেজর গাঙ্গুলি গর্জে ওঠে—তাই দেব।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় তাঁর ট্যাঁক তো গড়ের মাঠ। তার রসদদার ওই সর্বেশ। কিন্তু গত সন্ধ্যা থেকে সেও বেপাত্তা। টাকাকড়ি তার কাছেই রয়েছে। শুধু ওদের খরচাই নয়—এবার বাংলোর খরচাও লাগবে। অথচ সর্বেশের দেখা নেই।

মেজর গাঙ্গুলি বলেন।

—একটু অপেক্ষা করো, সর্বেশ ফিরলেই তোমাদের পাওনা কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেব।

মিসেস গাঙ্গুলিও বলে।

—তাই দাও, আর দিয়ে থুয়ে আজই বের হয়ে চল এই বনবাস থেকে। উঃ, এমন ঝামেলায় পড়তে হবে জানলে কে আসতো এই বনে। আসুক সর্বেশ—আজই চলো এখান থেকে।

এমন সময় জিপ নিয়ে এসে হাজির হয় ফরেস্ট অফিসার তেওয়ারী, সঙ্গে পুলিশের জিপ। পুলিশ অফিসার এখানে শমনদমনবাবুকে স্যালুট করে। হাজার হোক এম. পি, সাংসদ। জনপ্রতিনিধি। বলে ও. সি।

—স্যার, আপনি! এখানে?

শমনদমন বলে—ওই পাগলা লোকটা আমার ভাইপোদের গুলি করে মারত না এসে পড়লে।

মেজর গর্জে ওঠে—আমি পাগল নই, আমি মেজর গাঙ্গুলি। অরিদমন

গাঙ্গুলি।

—শমনদমন আমি। কথাটা ওকে জানিয়ে প্রশ্ন করেন শমনদমন মিঃ তেওয়ারীকে।

– এখানে ?

ফরেস্ট অফিসার বলে—সবই বলছি স্যার। মেজর গাঙ্গুলি, সর্বেশ বাবুকে কাল রাতে আমরা কয়েক লাখ টাকার চোরাই কাঠ, হাতির দাঁত, বাঘের চামড়া এসব বন থেকে বেআইনীভাবে পাচার করার সময় হাতে-নাতে ধরেছি। সে একজন কুখ্যাত স্মাগলার—পোচার, ক্রিমিন্যাল।

চমকে ওঠে মিসেস গাঙ্গুলি।

সে কি! ওগো ইনি কি সব বলছেন—

মেজর গাঙ্গুলি গর্জে ওঠে—ইমপসিবল! সর্বেশ কখনই এসব কাজ করতে পারে না! আপনারা ভুল করেছেন।

এবার রঞ্জন বলে।

—না। সে একাজ এর আগেও করেছে। আমি জানি। তাই এই ক'দিন ধরে ওকে ওয়াচ করে কাল ধরা হয়েছে।

শমনদমন বাবু বলেন—রাইটলি সার্ভড। যারা অরণ্য-অরণ্যপ্রাণীকে ভালোবাসে না, তাদের ধ্বংস করতে চায়, তারা দেশের শত্রু, মানুষের শত্রু। তাদের ধরে ধরে জেলে পোরাই উচিত।

তেওয়ারী বলে—রঞ্জন আমার ক্লাসফ্রেণ্ড, ওইই সাহায্য করেছে স্যার, না হলে এতবড় একটা দুষ্ট চক্রকে হাতেনাতে ধরতে পারতাম না।

মেজর গাঙ্গুলি, সর্বেশবাবুর বাকী জিনিসপত্র আমরা সার্চ করতে চাই। আমাদের বিশ্বাস ওর কাছে আরও বেআইনী ব্যবসার কিছু ক্লু মিলবে।

মেজর গাঙ্গুলি বলে—কিন্তু সর্বেশ না হলে—

—তাকে পুলিশ হাজত থেকে আনবো দরকার হলে। কিন্তু বাধা দিলে আমরা আপনাকেও সর্বেশের কাজে সাহায্যকারী, সরকারী কাজে বাধাদানকারী বলে এ্যারেস্ট করতে বাধ্য হব। আর বাংলোর বুকিং ছিল সর্বেশবাবুর নামে। এই মুহূর্তে বাংলোর বুকিং বাতিল করা হল। আপনারা বাংলো ছেড়ে দিন রাইট নাও। আর এই ক'দিনের বাংলোর চার্জ বাবদ দুশো টাকাও মিটিয়ে দেন।

রঞ্জন বলে—আমাদের দুজনের কুক আর বেয়ারাগিরির ছ'শো টাকাও দিতে হবে স্যার!

মেজর এবার চুপসে যায়—টাকা! মানে আটশো টাকা। তারপর আমাদের ফিরে যাবার খরচা। এখান থেকে বের হবো কি করে?

মিঃ তেওয়ারী বলে—সেটা আপনার প্রবলেম, সলভ করবেন আপনি। চৌকিদার—গার্ড!

দুজন লোক এসে হাজির হয়। তেওয়ারী বলে।

—ওদের জিনিসপত্র সব এই মুহূর্তেই বাংলোর বাইরে এনে দিয়ে বাংলোর ঘরগুলো বন্ধ করে দাও।

মিসেস গাঙ্গুলি এবার কাতর কণ্ঠে বলে।

—আমরা এই বনে কোথায় যাবো?

আইভি, বেবীও এবার বিপদের গুরুত্ব বুঝে চুপ করে গেছে। এই গভীর বনে বিপদেই পড়বে তারা।

বাবাও নিঃসম্বল। সর্বেশবাবু তাদের এইভাবে চরম বিপদে ফেলে যাবে তা ভাবেনি।

আইভি বলে—সর্বেশবাবুর সুটকেশ, ব্যাগগুলো আপনারা দেখতে পারেন। ওই দুটো।

পুলিশ অফিসার একজন এম. পিকে সামনে পেয়ে বলে।

—স্যার, আপনি সাক্ষী। আপনার সামনেই ওর জিনিসপত্র সার্চ করছি আমরা।

ব্যাগ থেকে বের হয় বেশ কিছু কাগজপত্র, বেআইনী হাজার হাজার টাকা লেনদেনের হিসাব। মায় কার কার কাছে ওইসব হাতির দাঁত, বাঘের চামড়া কিনেছে তার খবরও পাওয়া যায়। কলকাতার কোন মহাজন এর আগে বাঘের চামড়া কিনেছে তাও জানা যায়।

মিঃ তেওয়ারী বলে—দারুণ খবর মিলেছে স্যার!

মিসেস গাঙ্গুলিও ক্রমশঃ বুঝেছে সর্বেশের ব্যবসাটা। তাদের মিথ্যা কথা বলেছে এতকাল ওই সর্বেশ।

আর মা হয়ে মিসেস গাঙ্গুলি ওই শয়তানের হাতে নিজের মেয়েকে তুলে দিতে গিয়েছিল। সেই চরম সর্বনাশ থেকে আইভিকে বাঁচিয়েছে ওই রঞ্জনই। আর রঞ্জন, অঞ্জন দুজনের আসল পরিচয়ও জেনেছে মিসেস গাঙ্গুলি।

মনে হয় তার আইভি ভুল করেনি।

বলে মিসেস গাঙ্গুলি স্বামীকে।

—সর্বেশ যে এমনি একটা ক্রিমিন্যাল তা তুমি বুঝতে পারো নি। বুঝেছিল ওই আইভি। তাই এড়িয়ে চলতো তাকে—ঘৃণা করতো। ওই মেয়ের ঘটে যেটুকু বুদ্ধি আছে তার ছিটে ফোঁটাও তোমার নেই। শুধু মদ গিলিয়েই সর্বেশ তোমার মাথা বিগড়ে দিয়েছিল। এখন এই বনে কি যে করি?

মিঃ তেওয়ারী বলে—আমার করার কিছুই নাই। আপনারা চলে যান এখান থেকে বাংলোর টাকা মিটিয়ে।

রঞ্জন বলে—আমাদের ছ'শো টাকা—

মেজর গাঙ্গুলি নীরব। তার গ্যাস বেলুন চুপসে গেছে। এবার মিসেস গাঙ্গুলি কাতর কণ্ঠে বলে।

—সর্বেশ আমাদের এভাবে বিপদে ফেলে যাবে ভাবিনি। এখন দুটো মেয়েকে নিয়ে এমনি বিপদে পড়বো জানতাম না। এখন বুঝেছি সর্বেশ আমাদেরও চরম সর্বনাশ করতে চেয়েছিল। আমার মেয়েটাও চরম সর্বনাশ থেকে বেঁচে গেছে ওই রঞ্জনদের জন্যই।

বাবা রঞ্জন, না চিনে তোমাদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি, এবার যদি তোমরা সাহায্য না করো চরম বিপদেই পড়বো। রঞ্জন, বাবা অঞ্জন!

রঞ্জন বলে—আমরা কি করতে পারি?

অঞ্জন বলে—আমাদের করার কিছুই নাই।

এবার গর্জে ওঠেন শমনদমন।

—ইউ ফুলস্। গাড়োলের দল। এ্যা—সত্যকে অস্বীকার করো তোমরা? মেজর গাঙ্গুলি যা পারে নি এবার আমি তাই করবো। আই শ্যাল স্যুট ইউ—ইউ কাওয়ার্ডস্!

চমকে ওঠে রঞ্জন—মানে? কাওয়ার্ড হলাম কি করে? এত বড় ঝুঁকি নিয়ে ওই স্মাগলারদের ধরলাম—

শমনদমন বলেন - অথচ একটা নিষ্পাপ নিরাপরাধ মেয়েকে ভালোবেসে — সেই কথাটা বলার সৎসাহস তোমাদের নেই! বোথ অব ইউ—তোমরা দুটোই ভীরু, কাপুরুষ, মিথ্যাবাদী!

চমকে ওঠে রঞ্জন, অঞ্জন।

শমনদমন এবার বলে আইভি, বেবীকে।

—কি মা, বলো আমি মিথ্যা কথা বলছি? যা বলেছি তা সত্যি নয়?

আইভি'র মুখে সলজ্জ হাসি ফুটে ওঠে। বেবী লজ্জায় মাথা নামায়।

শমনদমন বলে—নাও আই এম ক্লিয়ার। মিসেস গাঙ্গুলি, আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।

মিঃ তেওয়ারী বলে—কিন্তু বাংলোর চার্জ—

—আমাদের কুক, বেয়ারাগিরির চার্জ ?

মেজর গাঙ্গুলি ফুঁসে ওঠে।

—আমার কাছে কানাকড়িও নাই। যা খুশি তাই করতে পারো তোমরা। আমি সারেণ্ডার করছি—লাইক এ ডিফিটেড জেনারেল। পরাজিত সেনাপতি—

এবার হেসে ওঠে শমনদমনবাবু।

—ব্যস—ব্যস ! ওহে তেওয়ারী, তোমার বাংলোর চার্জ কত বললে ? —দুশো টাকা ?

—আজ্ঞে।

শমনদমনবাবু পকেট থেকে এবার মোটা পার্সটা বের করে দু'শো টাকা দিয়ে বলেন।

—তোমার বাংলোর ডিউজ ক্লিয়ার। আর ইউ কুক এ্যাণ্ড বেয়ারা চঙ্গু, মঙ্গু এই তোমাদের মজুরী ছ'শো টাকা ! নাও, খেটেছো, দাম নেবে না ?

রঞ্জন বলে—ওতো ওই মেজর সাহেবের দেবার কথা। আপনার কাছ থেকে কেন নেব ?

শমনদমন বলেন—আবার চক্ষুলজ্জাও আছে ? নাঃ, প্রফেশন্যাল কুক, বেয়ারা তোমরা কোনদিনই হতে পারবে না। এ টাকাটা আমি মেজর সাহেবকে ধার দিচ্ছি। পরে মায় সুদ উশুল করে দেবে।

রঞ্জন বলে—তাহলে ওই বাংলোর টাকাটাই দেন, আমাদের লাগবে না।

মেজর গাঙ্গুলি দেখছে ব্যাপারটা, বলে।

—বাংলোর চার্জ তো হলো, আমরা বন থেকে বের হবো কি করে ; তারপর কলকাতার গাড়ি ভাড়া-টাড়া—

শমনদমন বলে—ওর জন্য ভাববেন না।

এবার বলেন ওই রঞ্জনকে।

—ইউ বেয়ারা চঙ্গু, ক'দিনে কেমন চা বানাতে শিখেছিস দেখি—ভোরবেলা বের হয়েছি, চা জোটেনি, চা বানা।

এবার এগিয়ে আসে আইভি।

—কাকাবাবু, বসুন, আমি চা বানিয়ে আনছি। ও পারবে না।

শমনদমন দেখছে আইভিকে।

—কাকাবাবু !···আই মিন কাকাবাবু ! ভেরি গুড।

আর ক'দিন কুকগিরি করেছো তুমিই ওই রঞ্জন গাড়োলের হয়ে তা বুঝেছি। রঞ্জন, তোর মজুরির টাকা তাহলে তোর নয়, ওই আইভি'রই পাওনা, আর অঞ্জন—

—কাকাবাবু !

—তোর কাজ করেছে ওই বেবী ? এঁ্যা—দুটোই তো রাম ফাঁকিবাজ তা জানি। খাটলো ওরা, আর টাকা চাইছিলি তোরা ! আর অরিদমনবাবু, আপনার ক্যাম্পে আপনাদের চোখের আড়ালে এত বড় নাটকগুলো ঘটছিল দেখতেও পাননি ? অবশ্য চেনার মত চোখ আপনার ছিল না। এবার চোখ খুলে সব দেখুন-- কান খুলে শুনুন। একটা সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে।

আইভি বেবী এর মধ্যে চা-টোস্ট, কিছু সন্দেশ ডিম সেদ্ধ এসব করে এনেছে।

শমনদমনবাবুও ওদের চটপট এসব ব্যবস্থা করতে দেখে খুশিই হন। বলেন।

—তেওয়ারী, ইউ চঙ্গু, মঙ্গু এখন আর কুক বেয়ারা নও, বসে পড়ো। মেজর গাঙ্গুলি—হ্যাভ স্যাম ব্রেকফাস্ট। না চা-টা অপূর্ব বানিয়েছো আইভি। রঞ্জন—দ্যাখ, শেখ আসল চা কেমন করে বানাতে হয়।

এত কিছুর মধ্যেও মিসেস গাঙ্গুলি, মেজর গাঙ্গুলি খুশি হতে পারে নি। সর্বেশকে ঘিরে তাদের অনেক স্বপ্নই ছিল। মেয়েটার বিয়ে দিতে পারলে কিছুটা নিশ্চিন্ত হতো তারা, তাদের সংসারের দায়টা বইত সর্বেশই।

কিন্তু সর্বেশ যে এতবড় শয়তান ক্রিমিন্যাল তা একবারও ভাবেনি তারা। আজ সর্বেশ তাদের গাছে তুলে মই কেড়ে নিয়ে গেছে। নিজে তো পুলিশের হাতে ফেঁসেছে—তাদেরও এই গহন বনে ফেলে রেখে গেছে।

খেতে খেতে এবার শমনদমন বলেন।

—মিসেস গাঙ্গুলি, আপনারা আমাদের সঙ্গেই যাবেন।

বনের বাইরে বড়বিল শহরে নদীর ধারে আমার সুন্দর একটা ফার্ম হাউস, বাংলো আছে। আপনারা সেখানেই ক'দিন থাকবেন, বেশ নিরিবিলি। গাড়িও থাকবে। তারপর সব ব্যবস্থা পাকা হলে কলকাতায় ফিরবেন—শুভকাজ ওখানেই হবে।

মিসেস গাঙ্গুলি চাইল শমনদমনের দিকে। বলে সে।

—মানে, শুভকাজ! ঠিক বুঝলাম না।

শমনদমন এবার বলেন জোরালো গলায়।

—শুভকাজ মানে বিবাহ! এই গাড়োল দুটোর বাবা মা এণ্ড কোম্পানী এদের ঘরবাসী করার চেষ্টা করেও ফেল করে এবার আমাকে ওই ভারটা দিয়েছে। আর আমি সব দেখে শুনে ওই গাড়োল দুটোকে আপনার দুই মেয়ের হাতে তুলে দিতে চাই। যাতে ওদের ঘাড়ে বেশ মজবুত জোয়াল চাপানো হয়।

কি রাজী তো ?

শমনদমনবাবু বলেন আইভি বেবীকে।

—কি তোমরাও রাজী তো মা! অবশ্য এতদিন দেখেছো ওই দুটোকে, বোধহয় অমত হবে না।

এবার চমকে ওঠে মেজর গাঙ্গুলি।

—ওদের বিয়ে দিতে চান? শমনদমনবাবু ইউ আর রিয়েলি গ্রেট। আপনাকে চিনতে পারিনি মশায়।

মিসেস গাঙ্গুলি আজ খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায়।

সর্বেশের তুলনায় রঞ্জন অনেক ভালো ছেলে, আর বেবীর ভাবনা থেকেও মুক্ত হবে এবার। অঞ্জনও পাত্র হিসাবে সুপাত্রই।

মিসেস গাঙ্গুলি বলে—এতো ওদের সৌভাগ্য! আপনি হঠাৎ এসে এই চরম বিপদের সময় আমাদের যা উপকার করলেন তা বলে প্রকাশ করা যায় না।

শমনদমন বলেন।

—তাহলে বলবেন না। বলার কোন দরকারও নাই। ওহে তেওয়ারী অফিসের কাজে শহরে তো প্রায়ই যেতে হবে, আমার বাড়িটা শহরের সবাই চেনে—খবর নিয়ে আসবে কিন্তু। বরযাত্রী তো যেতে হবে।

তেওয়ারীও বলে।

—ও সিওর যাবো কাকাবাবু, রঞ্জনের বিয়ে আমি যাবো না তা কি হয় ?

রঞ্জন, অঞ্জন ভাবেনি যে, সব জটিলতার সমাধান এত সহজে এইভাবে হয়ে যাবে।

সুর্বেশের কেসটা এরমধ্যে সারাদেশে সাড়া তুলেছে। একটা দুষ্ট-চক্রকে পুলিশ খুঁজে বের করেছে যারা বিভিন্ন বন থেকে হাঁতির দাঁত, গণ্ডারের খড়্গা, বাঘের চামড়ার বিরাট কারবার করতো। হিমালয়ের তরাই, আসাম অঞ্চল থেকে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কেরালার জঙ্গল থেকে বন্য প্রাণীদের মেরে ওইসব মূল্যবান বস্তু সংগ্রহ করে ভারতের বাইরে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রী করতো।

আর অরণ্যের দামী গাছ কেটে সাফ করে মরুভূমি করে তুলেছিল অরণ্যভূমিকে।

···সেই শত্রুদের মুখোশ খুলে দেবে এবার তারা।

···গোছগাছ হয়ে গেছে।

মালপত্র দুটো জিপে উঠেছে। একটাতে চলেছেন শমনদমনবাবু, মেজর গাঙ্গুলি, মিসেস গাঙ্গুলি। পিছনের জিপে মালপত্র নিয়ে উঠেছে রঞ্জন, অঞ্জন, আইভি আর বেবী।

বেশ কিছুদিন আগে এই শাল পিয়াল মহুয়ার বনের মধ্যে রঞ্জন আর অঞ্জন এক ক্লান্ত দুপুরে কাঠের ট্রাকে সওয়ার হয়ে ঢুকেছিল।

সেদিন তাদের ট্রাকও ছিল খালি। সবকিছু জিনিসপত্র পথে ট্রেনে চুরি হয়ে গেছে। তবু কি দুর্বার আগ্রহ নিয়ে প্রায় নিঃস্ব রিক্ত অবস্থাতে এই বনে এসেছিল।

পেটে খিদে, ট্রাক অচল হয়ে যায় নালার জলে কাদায়। ওরা ড্রাইভারের গালিগালাজ শুনে দুজনে নেমে ট্রাক-এর চাকা ঠেলেছিল। ছিটকানো লালকাদা জলে সারা গা মাথা রঞ্জিত হয়ে ওঠে।

সেই খেটে খাওয়া মানুষদের বেশেই এই বনের ওই বসতে পেঁছে-ছিল দুজনে। কোথায় থাকবে, কি ভাবে দিন চলবে জানা ছিল না।

কুক আর বেয়ারা হয়েই বাংলোতে আশ্রয় পেয়েছিল। ক'টা দিন তাদের যেন কি স্বপ্নের ঘোরে চলে গেছে। তাদের জীবনে এসেছিল ওই

দুটি বিচিত্রময়ী রহস্য মেয়ে।

ওরা তাদের সাহায্য সহযোগিতাই করেছিল এখানে থাকার ব্যাপারে তাই রঞ্জন সর্বেশের মত একটা দেশের শত্রুকে শাস্তি দিতে পেরেছে। বাঁচাতে পেরেছে আইভি—বেবীর মত মেয়েদের ওই শয়তানের হাত থেকে।

আজ ফিরছে রঞ্জন, অঞ্জনরা সেই বনের পথ দিয়ে। সকালের গিনি গলা রোদ অভ্র রং ধরেছে। বাতাসে ওঠে শাল ফুলের মঞ্জরীর সুবাস, কোথায় একটা ময়ূর পেখম মেলে ডেকে ডেকে ফিরছে তার হারানো প্রিয়াকে।

…জিপটা চলেছে বনের বুক চিরে। সবুজ প্রশান্তির জগৎ। আজ সেই প্রশান্তির স্পর্শ ওদের মনে।

আইভি বলে—এই ছায়া সবুজ বনের মতই যদি সুন্দর হতো জীবনটা বোধহয় মানুষ অনেক সুখী হতে পারতো।

হয়তো তাই! মানুষ এই তাপসন্তপ্ত ঊষর জীবনে সবুজ প্রশান্তির সন্ধানই করে, কিন্তু কিছু মানুষ ভুল করে এই প্রশান্তির জগতকেও বিষিয়ে তোলে সামান্য পাওয়ার ব্যর্থ আশায়।

জীবনে তাই জটিলতা বেড়েই চলে, নিজের হাতে জ্বালানো চিতার আগুনে মানুষ তার ভবিষ্যৎ, তার শান্তিকেও আজ অগ্নিজ্বালাময় করে তুলেছে।

বনের বুক চিরে জিপ দুটো এগিয়ে চলেছে রৌদ্রস্নাত বনরাজ্যের স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে।

ওদের কণ্ঠে আজ খুশির সুর জাগে—জাগে আনন্দের গান।
